

তপোবনের বাণী

শ্রী প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
(স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী)

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/130

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.

শ্রীমদ্ বালানন্দ-শ্রীমদ্
(স্বামী প্রতাপানন্দ সরস্বতী)

শ্রীমদ্ বালানন্দ-শ্রীমদ্ গ্রন্থমালা—১

তপোবনের বাণী

শ্রীমদ্ বালানন্দ-শ্রীমদ্ গ্রন্থমালা-
১ম খণ্ড - দ্বিতীয়।

২৩.৬.৭১

২৩.৬.৭১

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
(স্বামী প্রতাপানন্দ সরস্বতী)

প্রকাশক :

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ :

দশহরা ১৩৭৩

মূল্য : দুই টাকা

মুদ্রক :

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নান্দানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

১/১১৭

নিবেদন

সেদিন পুরানো চিঠিপত্রের মধ্যে দেওঘর থেকে ২৮।২।৩৮ তারিখে লেখা ৩পিতৃদেবের একখানি পোষ্টকার্ড হাতে এলো। তখন আমি কৃষ্ণনগরে বি. এ. পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হ'ছি। লিখছেন :

‘প্রমথ আজ এক সপ্তাহ হইল তপোবনে গিয়া আছে। সেখানে উপরের কুটীরাতেই বাস করিতেছে, নীচে প্রায় নামে না। স্থানের নির্জনতা ও পবিত্রতা তাহার ধ্যানপ্রবণ চিত্তকে আরও ধ্যানমগ্ন করিয়া দিতেছে। এই সপ্তাহ হইতে ‘দেশ’ নামক কাগজে তাহার প্রবন্ধ পাঠাইতে আরম্ভ করিবে।’

শান্ত তপোবনে সমাহিত প্রমথনাথের নিবিড় আত্মাহুসন্ধানের ফল এই ‘তপোবনের বাণী’ পর পর পাঁচটি সংখ্যায় ‘দেশে’ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই ১৯৩৮ সালে। কৈশোরে তখন তা’র তাৎপর্য উপলব্ধি করিনি, তবু স্পষ্ট মনে আছে এক অব্যক্ত আনন্দ-স্পন্দনে চিত্ত তুলে উঠেছিল এগুলি পড়তে। মনে হয়েছিল শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জীবনী ও বাণীর সার্থক ভাণ্ড এতদিনে রচিত হ’ল।

এর কিছুকাল আগেই কৃষ্ণনগরে প্রথম দর্শন পাই প্রমথনাথের, তাঁর অগ্রজ আমার পূজনীয় অধ্যাপক ৩মমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায়। শুভ্র খন্দরের অনাড়ম্বর আচ্ছাদনে তপোভাস্বর গম্ভীর জ্ঞানমূর্তি। শুনেছিলাম তিনি বঙ্গভঙ্গের যুগে স্বদেশী আন্দোলনের উষাকালে দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিতপ্রাণ, স্বাধীনতা-যজ্ঞের একজন আদি হোতা, স্বদেশী শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য সত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মহামনীষীর সহকর্মী, আবার তত্ত্বাদিশাস্ত্রে স্ত্রাব্ জন উদ্ভ্রমের সহযোগী উপদেষ্টা। ৩পিতৃদেব তাঁর একখানি গ্রন্থও আমার কিশোর কোঁতুলী চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন, বোধহয় তা’র নাম Patent Wonder, যা’র পিছনে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকও ছিল, যেগুলির তাৎপর্য তখন না বুঝলেও তাদের ছন্দঃকল্লোল ও ধ্বনিগাঙ্গীরে বিমগ্ন হ’য়েছিলাম। তাই এ

হেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সামনে প্রথম গিয়ে দাঁড়াতে সসন্ত্রম বিশ্বয়েই সেদিন আমার কিশোর হৃদয় অভিভূত হ'য়েছিল।

সেদিন কিন্তু উপলব্ধি করিনি আমার সেজকাকা ৬লিতগোপাল তাঁর এই অগ্রজোপম সহপাঠীটিকে কেন 'প্রেমদা' নামে চিহ্নিত করেছিলেন! ত্যাগে তপশ্চায় কঠোর জ্ঞানতপস্বীর শুভ বহিরাবরণের পিছনে যে আপন অন্তরাত্মা বা প্রত্যগাত্মার প্রতি গভীর প্রেম প্রবাহিত ছিল তা' পঠদশাতেই ৬লিতগোপালের নজরে এসেছিল। তাই তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছে 'প্রেমদা'কে নিয়ে যান সেই প্রেমের চরিতার্থতার জন্ত। ৬গুরু-পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার প্রমথনাথের হৃদয়মুদ্র দু'লে উঠল, তাঁর প্রেমাভিসার পূর্ণতা লাভ করল। তারপর পরিণত বয়সে দীর্ঘ তপশ্চা ও দেশসেবার কঠোর কৃচ্ছতার তার নামিয়ে প্রমথনাথ রূপান্তরিত হ'লেন প্রত্যগাত্মানন্দে, ফিরে পেলেন স্বকীয় শিবসত্তা, তাঁর স্বধাম, আপন ঠাই।

সেই আপন ঠাইয়ের সজাগ অনুসন্ধানের পরিণত ফল এই 'তপোবনের বাগী'। সবাই আমরা খুঁজছি সেই আপন ঠাই, স্বরূপস্থিতি। তা খুঁজে পাওয়ার একমাত্র মহামন্ত্র বা সূত্র হ'ল : 'উলটু যাও', আবৃত্তচক্ষু হও, নজরটা ঘুরিয়ে বাইরে থেকে ভিতরে ফেল। নিজে থেকে নিজে একবার দেখ, প্রত্যভিজ্ঞায় আবার লাভ কর নিজের স্বরূপ-পরিচয়। কিন্তু আমরা তো শুধু 'বাহির পানে চোখ মেলেছি অন্তরে তো চাইনি।' তার ওপর সন্দিগ্ধ মন শঙ্কা তোলে : বাইরের রূপরসের জগৎ থেকে নজর ঘুরিয়ে, 'বাহির দুয়ারে কবাট' লাগিয়ে ভিতরে কেন গুহার অন্ধকারে নজর দিয়ে মরতে যাব? বিজ্ঞান তো বাইরের জগতে দৃষ্টি দিয়েই নিত্য নব নব বিশ্বয়ের সন্ধান দিচ্ছে। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে নানা ভোগস্বথের ক্রমোৎকর্ষের পশরা সাজিয়ে আমাদের দুয়ারে এনে হাজির করছে, তবে বিজ্ঞানের পথ ছেড়ে দিয়ে তপোবনের সেই প্রাচীন প্রজ্ঞানের পথ ধরব কোন্‌ দুঃখে? সে কি morbidityরই নামান্তর নয়? প্রমথনাথ এই প্রশ্ন দিয়েই আরম্ভ করেছেন তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা। স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে লেখা এই অপরূপ প্রশ্নোত্তর, শঙ্কা-সমাধানের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন সেই মহাসময়রের পরম

লক্ষ্যের পানে, যেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞানের রাখীবন্ধন রচিত হ'য়ে
জীবনের সার্থকতা এনে দেবে। মানব-সভ্যতা আজ যে-সঙ্কটের সম্মুখীন
তা'তে এই সমস্রয় খুঁজে না পেলে তা'র মহতী বিনষ্ট অবশস্তাবী। আমরা
যদি এখনো কান পেতে শুনি তপোবনের বাণী তা হ'লে হয়তো রক্ষা পাব।
এই উদ্দেশ্যেই আমরা এর পুনঃ প্রকাশে উজোগী হ'য়েছি।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের এই লেখাগুলি উদ্ধার করার ব্যাপারে স্মৃতিমান
তরুণ বন্ধু শ্রীমান শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করেছেন। 'দেশ'
পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক শ্রীমাগরময় ঘোষ পুরানো ফাইলগুলি দেখতে দিয়ে
আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় মুদ্রণের স্বযোগ-সুবিধা দান ক'রে বিশেষ আন্তরিকতা
করেছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শুভানীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক।

বর্ধমান, দশহরা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

কেন, কবে এ লেখা ?

তখন তরুণ বয়স, ২০/২১ বছর হ'বে। কলেজে বি. এ. পড়ি। আমহাস্ট'ল্লিটে এক মেসে তখন থাকি। শ্রীমান্ গোবিন্দগোপালের সেজকাকা, ঋষি-প্রতিম ৬প্রাণগোপালদাঁদার অল্প ললিতগোপাল আমার সহপাঠী। সে-ও সেখানে থাকত। জানতাম যে ললিত দেওঘরে শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজজীর রূপা লাভ করেছে, আর তাঁর একান্ত স্নেহধন্য মানস-সন্তান। ললিত তার ঘরে বসে' কখনও কখনও যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ পড়ত, আমি শুনতাম। রাম প্রশ্ন করছেন, বশিষ্ঠ উত্তর দিচ্ছেন। রামের কোনো একটা প্রশ্ন করার পর ললিত আমার দিকে তাকিয়ে কখনও বলত—আচ্ছা, প্রেমদা, বলুন তো বশিষ্ঠ এই প্রশ্নের কি জবাব দেবেন? আমার মুখ থেকে যে জবাবটা বেরুত, সেটা শুনে ললিত একটুখানি চমকে উঠে বলত—প্রেমদা! আপনি এখানে কেন রয়েছেন? এ যায়গা তো আপনার নয়। সত্যি, ললিত আমার ভেতরের ভাবটা কি করে' যে ধরত তা সে-ই জানে। কিন্তু সে-বয়সেই আমার নিজের মনে একটুখানিও সংশয় ছিল না যে আমি ঠিক যায়গায় নেই; সে যায়গাটা রয়েছে অগত্যা।

একবার গুরু-পূর্ণিমা আসন্ন। ললিত বলল : প্রেমদা! চলুন না এবার দেওঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের করণীবাদ আশ্রমে। শুনেই মনে হ'ল এটা আমার সেই নিজের যায়গার আহ্বান, আমাকে সাড়া দিতেই হ'বে। গুরু-পূর্ণিমার দিন আমরা শ্রীশ্রীমহারাজের আশ্রমে গিয়ে হাজির হ'লাম। সেখানে পা দিয়েই বুঝলাম যে এ যায়গাতে আমার জীবনে কিশোরের জাগ্রৎ জ্যোতির্ধন স্বপ্ন, তরুণের রসনিবিড় ধ্যান, ভাবিকালের জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-সমন্বয়-সমাধান—সবই যেন বাস্তবে মূর্ত হ'য়ে বিরাজ করছে। সেই প্রাচীন নৈমিষারণ্যের মত শান্ত, সুন্দর, একান্ত পরিবেশ। নিকটে তখন কোনো লোকালয় হয়নি। চাঁদনীর কান্তোজ্জ্বল বনশ্রী কৃত্রিম সৌদামিনী-ছটায় চল-চপল-চঞ্চলাও হয়নি। দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর, মাঝে মাঝে শালবন, দূরে দ্রিকুট প্রভৃতি স্থায়-

বিজ্ঞান পর্বতশ্রেণী। আশ্রমে যেখানেই বসি, প্রণবের অনাহত নাদ কর্ণকুহর আপূরিত ক'রে দেয়। তখন আশ্রমেও বেশী বাড়ীঘরদো'র হয়নি। একটা বড় শিবমন্দির আর দুই চারজন ব্রহ্মচারী শিষ্যদের থাকবার জ্ঞান 'রামনিবাস' বলে একটি ছোট বাড়ী। শ্রীশ্রীমহারাজ সেই মন্দিরেই অবস্থান করতেন। মন্দির-অভ্যন্তরে তাঁর সাধন-গুহা ছিল, যেখানে তাঁর সিদ্ধ যোগাসন পাতা রইত। মন্দিরের চারধারে যে খোলা উঁচু রোয়াক তারই একপ্রান্তে একটা উচ্চ বেদীর উপর বসে তিনি ভক্ত এবং শিষ্যদের দর্শন দিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে অল্পপম সৌম্যমধুর স্বরে প্রসঙ্গ করতেন। আমারও তাঁর চরণে প্রথম প্রণতি-অর্ঘ্যটি দেবার শুভ-সৌভাগ্য হ'য়েছিল সেই যায়গাতেই।

প্রথম প্রণতিটি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে আমি যে আপন যায়গার সন্ধানে বেরিয়েছি সেটা নিশ্চয়ই এই যায়গার মতনই জ্ঞান-বৈরাগ্য-তপোবীৰ্য-মণ্ডিত এক যায়গা। প্রথম দর্শনেই শ্রীশ্রীমহারাজকে দেখলাম যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর-মূর্তিতে—একাধারে পরম যোগী ও পরম জ্ঞানী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তিনি ভক্তদের কাছে যে প্রসঙ্গ করতেন তা'তে কেবল কর্ণরসায়ন মধুকণা নয়, হৃৎকর্ণরসায়ন অমৃতবরীই ক্ষরিত হ'ত। আর, সে অমৃতবাণী শুনে মনে হ'ত যে তরুণ জীবনের গভীরতম রসমত্তম পিপাসা যেন এরই জ্ঞান এতদিন উদ্গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। অন্তরের সেই অনির্বচনীয় মুক রস-সংবিত্তিকে আজ আর ভাষা দিয়ে মুখর করতে চাইব না।

সেই গুরু-পূর্ণিমাতেই আমার প্রাণগোপালদাদার সঙ্গেও প্রথম দেখা হয়। তিনি তখন বড় চাকুরে কিন্তু কী স্নেহ-স্বধামাখান লালিত্য তাঁর প্রথম সম্ভাষে আমার সাথে—সে তো কোনোদিন ভুলবার নয়। ললিত অকালে চলে যায় আমাদের ছেড়ে, কিন্তু প্রাণগোপালদাদা আমাকেই তাঁর স্নেহের 'ললিত' ক'রে রেখেছিলেন শেষ অবধি।

সেই প্রথম দর্শনের পর আমি মাঝে মাঝে দেওঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের চরণ-প্রান্তে ছুটে আসতাম—লৌহ যেমনধারা অস্বস্তান্ত মণির আকর্ষণে ছুটে আসে। প্রতিবারই এসে অল্পভব করেছি যে তরুণজীবনের সব কিছু কর্ণ-ব্যস্ততা ও ভাবচাকল্য এখানে এসেই তা'র স্থির কেন্দ্রবিন্দুটি লাভ করছে।

জীবনের যত কিছু মুঁষষণা এখানে এসে তা'র ঋণ সত্য যে পীঠ, তা'তেই প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। কাজেই মাঝে মাঝে আমাকে এখানে আসতেই হ'ত। কখনও কখনও শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে তপো পাহাড়ে গিয়ে গুহায় কিছুক্ষণ বসে আসতেও বলতেন। তাঁর কথামত বসভাগও গিয়ে কখনও কখনও। বসলে পর অল্পভূতির যে সব গভীর পরদায় বন্ধার বাজত, তাদের ভাষায় রূপ অথবা বাণী দেওয়া তো আভাষে ইঙ্গিতেও চলবে না। “তপোবনের বাণী” ভাবিকালে তা'র কিস্তী কুণ্ঠিতা স্বরলিপিমাত্র।

এইরকম কিছুদিন কাটার পর সহসা এ জীবনেতে একটা বিপুল বজ্রা যেন উদ্বেল হ'য়ে এগিয়ে আসলো। সেটাকে রোধ করতে পারিনি বছবর্ষ। সেটা হ'চ্ছে—এ অবনত ভারতের দাসত্ব-শৃঙ্খলিত দেশাঙ্গার সর্বাঙ্গীণ মুক্তির তরে যে মহীয়সী আকৃতি, তাই। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেই আমাকে সে-মহাপ্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে হ'য়েছিল, তপোবনের সে নিরালা শান্ত গুহার নিগূঢ় আকর্ষণও আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তবে অন্তরের গভীরতম প্রত্যয়ের মাঝে যে সে-তপোগুহা আপন সমাহিত মহিমায় বিরাজ করছিল তা'তে আমার কোনোদিন সংশয় আসেনি। ভিতর ও বাহিরে, সত্তার অন্তঃপ্রকোষ্ঠ ও বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়ে আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত সে-গুহাকেদ্রীণ স্থির কক্ষরেখা থেকে চ্যুত করেছিল বটে, কিন্তু আপন লক্ষ্যবিন্দুচ্যুত কোনোদিনই সেটা করেনি। সে-কক্ষপথে সহজ স্বেচ্ছা গতির স্থলে যেন কিছুটা বিষম ও ব্যাবৃত্ত গতি এসেছিল। তাই বুঝি মনে হ'ত—কেজ্ঞ থেকে যেন কতদূরেই না স'রে যাচ্ছি! সে যাই হোক, জাতীয় বিপ্লবের যেটা পন্থা, সেটা আমাকে তপোবন থেকে ক্রমে অনেকটা দূরেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সন্দেহ নেই। এইভাবে দেশের জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম—এই সব তা'তে বেশী ক'রে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে, দেওঘরে সেই আপন যায়গাটায় মাঝে মাঝে গিয়ে থাকা আর ঘটে উঠতো না। শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে বছবর্ষ আমার এই বাহ্য ‘বহিরঙ্গ’ ব্যবধানেই জীবনটা কাটল। যদিও অন্তরে গভীর অন্তরঙ্গ যোগ কোনোদিনই কাটবার মত হয়নি বা ছিল না।

বহু বর্ষ কেটে গেল এ ভাবে। তখন প্রবীণ বয়স। দেশের কাজের, বিশেষ ক'রে কলম চালানোর কাজের 'কমলি' তখনও ছাড়েনি, তবে বাহিরের কাজের বাঁধন আলগা হ'য়ে আসছে। তরুণ জীবনে বরণ্য সহযোগী শ্রীঅরবিন্দের এবং ঔপনিষদ বিজ্ঞানের পূর্ণ সমন্বয়-যোগের আকর্ষণই তখন অন্তরে বড় হ'য়ে উঠছে। এই সময় একবার কৃষ্ণনগরে যাই। সেখানে মম্বথাদাদার মুখে গুনলাম—দেওঘর থেকে প্রাণগোপালদাদা আমাকে তলব ক'রেছেন। কি জন্তে? দেওঘর আশ্রমে ব্রহ্মচর্যভিত্তিক এক মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। সেটা দেখবার, আর সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্তে। গেলাম সেখানে। আবার বহুবর্ষ পরে শ্রীশ্রীমহারাজের চরণপ্রান্তে। সেবার প্রথম শ্রীমন্ মোহনানন্দজীকে দেখলাম—শ্রীগুরুসেবাত্রত্ননিরত, তরুণ, মধুরোজ্জল হোমাব্দকাস্তি।

তারপর আর বেশীদিন শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর শরীরে থাকেননি। ১৯৩৭ সালের ২ই জুন (জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদ ১৩৪৪ সন) তাঁর মহাসমাধিলাভের সংবাদ পেয়ে যখন দেওঘরে যাই, তখন আশ্রমে সে পরম দেনীপায়মান যোগীন্দ্র ভাস্কর তাঁর প্রকট মহিমায় অন্তর্মিত। প্রাণগোপালদাদা প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানগরিষ্ঠ শিষ্যেরা বললেন—আমাকে মহারাজের এক জীবনী সঙ্কলন ক'রতে হ'বে। ভূয়িষ্ঠ অন্তঃপ্রেরণা ব্যতীত এ কাজে হাত দিতে সাহস হ'ল না। তাই “ছোটবাবা” (৮পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী) সঙ্কলিত জীবনীর (অসমাপ্ত) পাণ্ডুলিপিখানা নিয়ে, গেলাম তপোবনে সেই গুহাভ্যন্তরস্থ পুণ্য সিদ্ধপীঠে। বেশ কয়দিন সেখানে থাকলাম—সেই তপোনিবিড় ধ্যানমোহন পীঠস্থানেই। কতবার লেখনী হাতে নিলাম—কিন্তু ছোটবাবার নিজের লেখাটার ওপর লেখনী-চালনা তো সম্ভব হ'ল না আমার! সেইটাতোই আমার কুণ্ঠাহীন আন্তর অল্পমোদন দিয়েই ক্ষান্ত হ'লাম। তবে হ্যাঁ—মহারাজের জীবনে পূর্ণ-সমন্বয়যোগকে বিষয় ক'রে একটা দীর্ঘ ভূমিকা সম্ভবতঃ লিখেছিলাম। সেটার পাতা আমার এখন জানা নেই। তবে, গুহায় থাকার সময় মহারাজের পূর্ণযোগ-সিদ্ধপীঠের একটা অপূর্ণ নিগূঢ় আন্তর পরিচয় পেয়েছিলাম। সেটাই “তপোবনের বাগী”। “দেশ” পত্রিকায় লেখাগুলো বেরিয়েছিল। আজ অশেষ

মেহতাজন শ্রীমান্ গোবিন্দগোপাল উদ্যোগী হ'য়ে সেগুলো পুনঃ প্রকাশিত
ক'রছেন। অনেকদিনকার লেখা, তবু মনে হয়, আজও নতুন ক'রে শোনার
মত হ'বে। ইতি—

(ভূতপূর্ব) অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

3/130

১/১১

ওঁ

আত্মর্থেন বিধৃতকন্মষহৃদি ধ্যানান্বজব্যঞ্জকং
 আবর্থেন চ কর্ণিকান্তরনিজজ্যোতির্ভিরুদ্ভাসিতম্ ।
 তান্তীয়েন লকারলালিতরসমাতায়মানং মুদা
 বালানন্দমনাথদীনশরণং বন্দে গুরুং শঙ্করম্ ॥

(ষাঁহার নামের) আদি বর্ণ 'ব'কারের দ্বারা হৃদয়ের সব কন্মষ বা পাপ
 'বিধোত' করিয়া ধ্যানকমলটিকে 'ব্যক্ত' করেন বা ফুটাইয়া তোলেন, 'আ'কারের
 দ্বারা কর্ণিকার 'আন্তর' অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ নিজ জ্যোতিঃপুঞ্জ দ্বারা উদ্ভাসিত
 করেন, তৃতীয় বর্ণ 'ল'কারের দ্বারা রসকে 'লালন' করেন এবং পরবর্তী
 'আ'কারের দ্বারা তাহাকেই অর্থাৎ সেই রসকেই 'আতত' অর্থাৎ বিস্তৃত
 করেন আনন্দে—সেই অনাথ ও দীনজনের একমাত্র শরণ বা আশ্রয়, শঙ্কররূপী
 গুরু 'বালানন্দ'কে নমস্কার ।

শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

আবার সেই তপোবন। তপোবনের দৃষ্টি মেলাবার দিন কি আজও আসেনি, না, সেদিন বুঝি অনেকদিন চ'লে গেছে? তপোবনের দৃষ্টি কি শুধুই উদাসীনের দৃষ্টি, না আর কিছু? তপোবন কি শুধু তাকিয়েছে সোজাসুজি বাঙ'মনের পারে যে ব্রহ্মনির্বাণ বা শূন্যনির্বাণ, তারই পানে? ওপরের দিকে চেয়েছে ব্যোমের অসীম অবাধ বিস্তারে আপনাকে নিঃশেষে মিলিয়ে দিতে—‘সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্’? অথবা, অন্তরের গুহার নিরাল। যবনিকার ওপাশে খুঁজেছে, যদি দেখতে পাওয়া যায় নিষ্কম্প স্নিগ্ধোজ্জল অথও কোন এক দীপজ্যোতি? যে চঞ্চল দৃষ্টি হয়ে চারধারে ছুটে যেতে চায়, তাকে ফাঁস পরিয়ে বেঁধে রেখেছে, রাখতে চেয়েছে, নাসাগ্রে, ললাটে? কেন? এইটেই কি প্রথম ভূমিকা, শিক্ষানবিশী, তার ঐ রকমধারা উর্ধ্বলীন অথবা অন্তর্লীন হবার প্রয়াসে? আমার চারধারে রূপরসবাণী গন্ধস্পর্শের যে অপরূপ পটখানা জীবন্ত চলচ্চিত্রের ভঙ্গিতে আপনাকে এত না মাধুরীতে লুটিয়ে দিচ্ছে, তাতে মিলল' না কি, তাতে ভয়ই বা কিসের যে, দৃষ্টিকে ধমকে নাকের ডগায় বেঁধে শায়েস্তা ক'রতে হচ্ছে এমন ধারা? কিসের পান্ডা লাগাতে পারলাম না, কে আমায় ভয় দেখালে ব'লে আমি পালিয়ে এলাম নিজের “নাকের গোড়ায়”, যেখানে একটা নিভৃত নিশ্চিন্ত ঠাঁই মিলবে ভেবে, অথবা সেখান থেকে ঐ ওপরেই হোক আর এই ভেতরেই হোক, কোন এক “পুরা ভাণ্ডারের”, কোন এক “অভয়ের বৈঠকের” হৃদিশ মিলতে পারে ভরসা ক'রে? মধু, রস যদি চিরন্তন খোঁজার বস্তুটি হয়, তবে সে মধু কি বাইরে আকাশ-

বাতাস, সরিৎসিদ্ধি, ওষধি- বনস্পতি, উষা-সন্ধ্যা, সূর্য-চন্দ্রমা—এসব-
তাতেই একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল ? ঐ ওপরটাতেই যদি যেতে
হয়, তবে এই বাইরেরটাকে একদম ছেড়ে এসে, ওর কোন রকম
সঙ্গ না ক’রে, পালিয়ে আসতে হবে নাকের ডগায় আর সেখানে
অনিমেমে তাকিয়ে তাকিয়ে স্থির মগ্নতার ঘোরে খুঁজে পেতে হবে
আপন অন্তর-গুহায় ঢোকার একটা গোপন সন্ধিপথ ? কেন,
উর্ধ্বগতি, উর্ধ্ব অভিযান কি আদৌ সম্ভব হবে না নিজের ভেতর
একটা গোপন সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করতে না পারলে ? সুষুম্নামার্গ,
ষট্চক্রভেদ, নাদ-সাধন, প্রত্যাহার, ধ্যান-ধারণা এসবের কোন
একটা পথ না ধরলে ওপরে ওঠা যাবেই না ?

তপোবনের পথ কি বাইরেটাকে একদম বর্জন করা, তার সঙ্গ
একেবারে ত্যাগ করার পথ ? ওখান থেকে—ভয়েই হোক আর
অতৃপ্তি অস্বস্তিতেই হোক—ভেতরে পালিয়ে আসতেই হবে ? নইলে
উপায় নেই ? কেন, তপোবনের এই যে কালো পাথরখানা, এতে
যতই না মাথামুড় খুঁড়ি, সে কিছুতেই সাড়া দেবে না, পান্ডা
লাগিয়ে দেবে না আমায়, আমার যেটা “ঠিকানা” তার ? ঠিকানা
তো—ওপরেই বল, ভেতরেই বল, আর আশেপাশেই বল—মধুর
পুরা ভাণ্ডারটা—যার পরিচয় মধুর থেকে মধুমত্তমের আশ্বাদনে।
বৈঠক তো রসের অবাধ অফুরন্ত “খোলাভাঁটি”—অখণ্ড, পুরা, তাজা,
সাম্রা রস। তাই তো ঠিকানা, নয় কি ? আর, যেখান দিয়েই
পথ বাতলে দাও,—বাইরের ঐ সড়কে “No thoroughfare”
 (“নো থরোফেয়ার”) লটকে দাও আর নাই দাও—এটা সোজা-
সুজি বোঝা যাচ্ছে যে, ঠিকানায় যাবার পথ আসলে একটাই।
সে পথটা হচ্ছে—ছন্দ। ছন্দ লাগানো আর মেলানো। যেখান
থেকে, যেদিক দিয়েই যাও, ছন্দ rhythm (রিদম), harmony

(হারমোনি)-ধ'রে চলতেই হবে। যতক্ষণ ওটা ঠিক আছে, ততক্ষণ জানছি পথ ঠিক আছে। ছন্দ নড়চড় হয়নি তো? যদি বুঝলাম হয়নি, তবে নিশ্চিত—পথটি আমার ভুল হয়নি। ঠিকানায় পৌঁছে দেবেই। ঠিকানায় যে বস্তুটি রসঘনমূর্তিতে রয়েছেন, সে মূর্তি হচ্ছে “ত্রিভঙ্গঠাম” মূর্তি। রস, জ্যোতি, ছন্দ—তিনে এক, একে তিন। শ্রীকৃষ্ণরূপে যদি তায় দেখ, তবে দেখ ছন্দ কি আশ্রয় ক'রে রয়েছে শুধু তার মুরলীতে আর তার নূপুরে? ছন্দোময়ী সে তনু। তাতে যা কিছু তাই ছন্দ।

ঐ ঠিকানায়, ঐ বৈঠকে ছন্দের হ'ল পরিপূর্ণতা। রসের ঐ পরিপূর্ণতা, জ্যোতিরও। আর সব-কিছুতে, কি জানি কেন, ঐ অখণ্ড, পরিপূর্ণ হয়েছে অপূর্ণ, খণ্ডিত। অথবা যদি বলতে চাও তো বল—অপূর্ণ খণ্ডিত হবার মত হ'য়েছে, সত্যি হয়নি। এই পাথরটায় তার খোঁজ তো না পাবার মতোই। পাথরটায় আবার ছন্দ, রস, জ্যোতি! কই খুঁজে তো কিছু পাইনে! আমাদের চলতি কারবারি দৃষ্টিটা বড় যে শুকনো দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে যে উথল সাগরও শুকিয়ে তাতল সৈকত হ'য়ে যায়। কবির দৃষ্টি, মিস্টিকের দৃষ্টি, শিল্পীর দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি হ'ল রসিকের দৃষ্টি। সে সব দৃষ্টি এহেন পাথরেও ছন্দের সন্ধান পায়, পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রসের, জ্যোতিরও। প্রেমের দৃষ্টিতে—সবতোতেই “কৃষ্ণ ক্ষুরে”! জ্ঞানীও—সর্বভূতস্বমাত্মনাং—সকল “পুরে” সেই একই “পুরুষকে” শুয়ে থাকতে দেখেন। কেন দেখেন, কেমন ক'রে দেখেন, সে পরের কথা। বোধ হয় তা করতে গেলে, আগে এক জায়গায় তার খাঁটি পাত্রা লাগিয়ে তার পরিচয় আশ্বাদটা নিতে হয়। আর, বোধহয়—বোধহয় ক'রেই বলছি—সে জায়গাটা হচ্ছে আমারই অন্তরতম বস্তুটা। সেখানে জ্যোতি বল, ছন্দ বল তার খাঁটি পাত্রাটি আগে লাগাতে হয়। লাগানই

সুবিধে। লাগাতে পারলে তখন নিজের ভেতরে সব কিছুর খাঁটি
 আশ্বাদ নেবার একটা রসগ্রাহী “রসনা” ফুটে বেরুবে। তা বেরুলে,
 তখন এই পাথরখানাও কত মিষ্টি লাগবে, এর রেণুতে রেণুতে
 জ্যোতি ঠিকরে পড়বে, এর পরতে পরতে রসের ঝরণা ঝরে যাবে,
 এর রস্কে রস্কে বেজে উঠবে হৃন্দের পূর্ণ ঐশ্বর্য, হৃন্দের পূর্ণ মাধুর্য !
 কবি, শিল্পী, ভাবুকের এ গুঢ় আশ্বাদনের রসনাটি স্বভাবতঃ কিছু
 সজাগ থাকেই। বৈজ্ঞানিককে কত গবেষণা, কত গণা-গাঁথার
 ভেতর দিয়ে ঐ নিগূঢ় হৃন্দের পাত্র লাগাতে হয়। হৃন্দের খানিকটে
 ধরা পড়ে, খানিকটে লুকোচুরি খেলে, ধরা দিতে চায় না। পূর্ণ
 হ’তে হ’তে অপূর্ণ র’য়ে যায়, অখণ্ড হ’তে হ’তে খণ্ডিত হয়ে যায়।
 বিজ্ঞানে এখনও মেলেনি—জড়ে, প্রাণে, মনে কোথাও পূর্ণ অখণ্ড
 অটুট হৃন্দোরূপটি। সব তায়, হৃন্দের নিখুঁত পূরা “প্যাটার্ন” নিয়ে
 ছাঁচ তোলা যাচ্ছে না। বাদ-সাদ প’ড়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু
 কাঁচা মাল প্যাটার্নে ঢুকতে নারাজ হচ্ছে যেন। এ লুকোচুরি
 খেলাতেই না রস, আর, খেলতে খেলতে যত না এগিয়ে যাচ্ছি,
 ততই আরো রস আরো আলো! সমস্তার কুহেলিকা মিশকালো
 হ’য়ে উঠলেও সেই কালোর ভেতরেই আলো ফেটে বেরিয়ে আসে
 যে! আলেয়াও দিচ্ছে দেখি আলোর সন্ধান! মণিপ্রভায় মণিভ্রম
 হ’লেও মণির উদ্দেশ্য তাতে ক’রে হবে যে! তাই বলি—বিজ্ঞানের
 এই হৃন্দোবস্র ক্রমশ পুরা হৃন্দের সন্ধানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ব’লে,
 এও হচ্ছে রসের সরণি, জ্যোতির্মার্গ। ঠিকানার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।
 পাথর ঠুকেও আগুনের ফিন্‌কি বেরোয়। তাতে শুষ্ক ভৃগুচ্ছ
 ধরিয়ে তাই থেকে প্রদীপও জ্বালা যায়। কিন্তু যদি কোথাও প্রদীপ
 জ্বলতেই থাকে, তবে সেখানে আগে খোঁজ নেওয়া ভাল নয় কি?
 তপোবন যদি ঐ পাথরটা থেকে গোড়ায় দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে

ভেতরে প্রদীপের খোঁজ ক'রে থাকে তো, বেকুবের কাজ করেনি নিশ্চয়। ছন্দের রাস্তা ধ'রে—তা'ছাড়া দোসরা রাস্তা তো নেই—মন, একটা ঠাঁই আগে খুঁজে নাও না কেন, যেখানে রস জ্যোতি নিজেকে কত না পরদায় লুকোতে গিয়েও লুকোতে পারেনি! কত না আড়ালে আবড়ালে থেকেও সে হারানিধি যে সব আলো ক'রে রয়েছে, সবকিছু রসসিক্ত সরস করে দিচ্ছে! তাতে এমনি মিষ্টি যে তার পরশে সব-কিছু মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে! তার গোপন আলোতেও যে সব করে ঝলমল! নিজের অন্তরের মণিকোঠা ছাড়া সে নিধিকে অমন করে যে আর কোথাও পাইনে। তাই না সব ছেড়ে ভেতরে ঢুকেছি!

তপোবনের ভিতরে ঢোকা ঐ জগৎ। ভেতর বাইর, উপর নীচ, এদিক ওদিক—সবইতো বারবার আনাগোনা করছি। এটা ঠিক যে, রসিক হ'য়ে, পিপাসু হ'য়ে, মরমী দরদী হ'য়ে “ধরণী” দিলে পাষাণের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যাবে, আজ না কাল। ঐ পাথরও সাড়া দেবে—তার ছন্দ জ্যোতি রসের খনি আমার কাছে উন্মুক্ত করে দেবে। নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু রসের রসিক, ছন্দে কুশলী, জ্যোতিতে জীবন্ত তেজোবন্ত হ'য়ে আসিনি যে! সাড়া দেবে কাকে? যে জড়, যার আপনাতে না আছে রস, না আছে ছন্দ, না আছে জ্যোতি সে পাবে সবতাতে জড় ছাড়া আর কার সাড়া? বিশ্বতোমুখ, সর্বতোমুখ সর্বতোক্শিণিরোমুখ সে রসঘন সন্তা, সত্যিই। ঐ একরত্তি ধুলোর মুখেও সে “ফুটি ফুটি” ক'রছে যেন! সে মুখেরও ঠিক মুখোমুখি হ'তে পারলে সেই আলোর কেন্দ্রে, সেই রসের খনিতে, সেই ছন্দের মরম সন্ধিতে যাওয়া যাবে বটে। কিন্তু যে বিমুখ, যে পরাঙ্গুখ, তার কি হবে বলতো? এর জগৎ আগে আত্মরসটি খোঁজ করে রসিক ব'নে নাও। রসিক যখন হবে তখন

ঐ ধুলো-বালিও করবে তার পুরো “রসস্রু নিবেদনং” রসিক তোমার কাছে। তার আগে নয়। অরসিকে কদাপি নয়, কদাপি নয়, কদাপি নয়।

যেখান থেকেই শুরু কর, ভাঙারে ঢুকে পড়ার সন্ধি তাতে মিলবেই। ধুলো, পাথর, একটা পাতা, একটা কীটপতঙ্গ—যারই “মুখে” শুনতে চাইবে, তারই মুখে শুনতে পাবে নিঃশেষে সব কথা। কিছু বাদ যাবে না। ও-মুখে কথা কইতে চাইছে যে, তোমার অন্তরাঙ্গায়ও সে-ই তো কথা কইতে চাচ্ছে! তোমার ভেতরে সে কথাটি শুধু কইতে চাইছে না, কইছেও। অল্প স্বল্প। তবু সে হচ্ছে রসের, জ্যোতির, ছন্দের কথা। আপনাকে তুমি তাই না এমন করে ভালবাস, আপনাতে এমন ক’রে লেগে থাক। তোমার ঐ যে একরত্তি আশ্বর্যসাম্বাদ ঐটেকে আগে ফুটিয়ে তোল। তার কুণ্ডা, তার কার্পণ্য ভেঙ্গে দাও। তার ফাঁসগুলো খুলে দাও, তার মুখে “পাথর”গুলো সরিয়ে দাও। তাকে মুক্ত, অনাবিল হ’য়ে ফুটে উঠতে দাও।

তাতে হবে কি? ছন্দ, রস, জ্যোতি—এ তিনের খাঁটি রূপ—পুরা প্যাটার্ন—প্রকৃতি বলে একটা কিছু আছে। যেমন দীপক রাগ। এ ছন্দের একটা অবিকল প্যাটার্ন আছে, নেই? সেটা ঠিক ঠিক আদায় হ’লে তবে তার পূর্ণতা, তার সিদ্ধি। যে যতটা তাকে আদায় করতে পারে। কারুর বা মোটেই হচ্ছে না, কারুর বা কাছাকাছি গেল। রস আর জ্যোতিরও একটা পুরা অখণ্ড রূপ আছে। সবকিছুতে সে রূপ খণ্ডিত, বিকল, বিক্ষুব্ধ দেখতে পাই। ঐ পাথরখানায় যেন সে রূপ হারিয়েই গেছে মনে হয়। কিন্তু আছে নিশ্চয়ই। বিজ্ঞান একভাবে তার পাত্তা লাগাচ্ছে। কিন্তু ঠিক পাত্তা লাগাতে হ’লে শুরু ক’রতে হয়—অচেনা অপাওয়া

অপরিচয়ের মধ্যে নয়, চেনা, পাওয়া পরিচয়ের মধ্যে। একটা সংশয়হীন পরিচয় ও আশ্বাদ থেকেই শুরু ক'রতে হয়। তা হলেই পাথরেই বা কি আর লতা-পাতাতেই বা কি, অন্তরঙ্গ পরিচয় ও আশ্বাদের একটা ফিকির বেরিয়ে পড়বে। ওদের সব্বাইকার সঙ্গে আমার হচ্ছে আবার নিতান্ত ভাষা-ভাষা বহিরঙ্গ পরিচয়! ওদিকে “আপন” বলে মনে করিনে। পর ভাবি। তুচ্ছ করি, ভয়ও করি। অন্তরঙ্গ পরিচয়টা হয় কিসে? নাড়ীর খবর পাই কিসে? বিজ্ঞান বাইরের অনেকগুলো পরদা সরিয়ে ক্রমশ আমায় অন্তরের দিকে নিয়ে চলেছে বটে। দেখছি বাইরের কাঁঠামোটা বেজায় ঠকিয়েছিল আমায়! একটু ধুলো, একটা জৈব-কোষের ভেতরেও রয়েছে এক বিপুল সম্ভাশক্তি—তৈজসী, ছন্দোময়ী! এতদূর এসে, এতখানি দেখেও কিন্তু দেখি আমার দেখার চোখে ঠুলিটি লেগেই আছে! অপরিচয়ের, অনাশ্বাদের দেখাই হচ্ছে সব। “এহ বাহু”—এত অন্তরমহলে এসেও “আমি” “এঁর” আপন হইনি যে, সেও আমার আপন হয়নি যে! এক অনাশ্বীয় বিরাটকে দেখে আমি বিশ্বয়ে হতভম্ব, ভয়ে জড়সড়।

রাস্তা ঠিক ধ'রেছি, কিন্তু প্রদীপটি হাতে না ক'রেই এই অজানা বিপুলের কুক্ষিতে সঁধিয়ে পড়েছি। নিজের অন্তরাঙ্গার অন্তঃপুরে যে প্রদীপটি জ্বলছে, তাই থেকে প্রদীপ ধরিয়ে এ মহাসুড়ঙ্গ-পথে যাত্রা ক'রতে হয় মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের চোখে প্রজ্ঞানের—ঐ রসজ্যোতিচ্ছন্দের পুরা অখণ্ডরূপের আশ্বাদের—অঞ্জনটি লেপে তবে যাত্রা ক'রলে ঠিক হ'তো। তবে না অগুর ভেতর ঐ তেজোময় দহর-ব্রহ্মাণ্ডকে চিনে নিতে পারতাম—আত্মবিলাসেরই জ্যোতির্ধাম, রাসমণ্ডলরূপে! আমার হৃদয়পুরে যার বিলাস, ঐ অগুর দহরেও তারই বিলাস।

এইজন্তে মনে হয়—যেখানে দেখছি প্রদীপ জ্বলছে, সেইখান থেকে প্রদীপটা ধরিয়ে তবে এ সব পথে ঢুকলে ভাল হয়। নইলে, সকল ছন্দ টুটে বিকল হয়ে রইবে, সকল রস খণ্ডিত হ'য়ে শুকিয়ে উঠবে, সকল জ্যোতি বাইরে থেকে আপতিত হ'য়ে আততায়ীর মত দেখার চোখ, চেনার চোখটাই ধাঁধিয়ে দেবে। ঘরে যেখানে সবতার চাবিকাঠি ঝুলান রয়েছে, সেখান থেকে সেটা পেড়ে নিয়ে তবে সব কিছুর তত্ত্ব-তল্লাসে বেরুলেই ঠিক। নইলে যো-সো ক'রে খানিকদূর ভেতরে ঢুকে রত্ন-পেটিকার চাবিটির জন্তে আবার ফিরে আসতে হবে। বিজ্ঞানকেও হবে। ছয়ারের পর ছয়ার খুলে ভেতরে চলেছি ; কিন্তু সকল মহল পেরিয়ে অন্তরতম স্থলের যত কাছাকাছি হ'তে থাকব, ততই দেখব,—একটা কি মন্ত্র, একটা কি সঙ্কেত, একটা কি মরমী কথা না বলতে পারলে যেন শেষের ছয়ারটি খুলবে না। যে খুঁজছে আর যাকে খুঁজছে তাদের স্বরে স্বরে, সুরে সুরে, ছন্দে ছন্দে যখন মিল হবে, তখন ছয়ার খুলবে, তার আগে নয়। “আপন” হ'য়ে ডাক দিতে হ'বে, তবে সে “আপন” হ'য়ে সাড়া দেবে, খিল খুলে দেবে। আপনাকে ঠিক ঠিক সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া চাই। বিজ্ঞান ঠিক ঠিক আপনাকে সঙ্গে নিতে ভুলে গেছে যে! কতকগুলো fact (ফ্যাক্ট) আর formula (ফর্মুলা) নিয়ে এগুচ্ছে। কিন্তু সেগুলো প্রাণবন্ত নয় যে! সেগুলো abstract (এবসট্রাক্ট)—কাটাছাঁটা শুকনো ঝরঝরে। গোড়ার fact, সকল factএর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আত্মায়, প্রাণের যেটা সজীব উৎস, তাই। আলোর ফোয়ারা, রসের উৎস। আর, প্রাণের যেটা আপন ছন্দ, তারই মৃত গুরু কাঠামো হচ্ছে ঐ সব জড়বিজ্ঞানের formula (ফর্মুলা)।

এই জন্তে বলছি—পালাতে হবে না কিছু থেকে, ভয়ও নেই

কোথাও। সবই যে রসজ্যোতিচ্ছন্দের বিগ্রহ ! সে বিগ্রহের সম্মুখীন হ'য়ে সোজা ক'রে আমি দেখছি, তাই ওটা হ'য়েছে পাথর। আমার যেটা চলতি ব্যবহার-জীবন, কারবারি সত্তা—তারই “শাপে” শ্রীবিগ্রহ হয়েছে পাষণ ! আমি ওকে বহিরঙ্গ করেই নেব, অন্তরঙ্গ ক'রে নেব না—এই বায়না ধরে রয়েছি যে ! তাই ওটা তুচ্ছ, জড়, অনাস্থীয়, একটা বস্তু—প্রাণহীন, চেতনাহীন ; তাতে রস নেই, ছন্দ নেই, আলো নেই ! কারবারের বন্দোবস্তে ওর সঙ্গে একরকমের সম্পর্ক আমায় পাতিয়ে রাখতে হ'য়েছে। নইলে এই মামুলি কারবার চলে না, তাই পাতাতে হ'য়েছে। আমি নিজে ইচ্ছে ক'রে পাতিয়েছি এমন নয় ; জীবের আর জড়ের পরস্পরাপেক্ষ যে বিকাশের ধারা তাতে ক'রেই ও-রকম সম্পর্ক পাতান হ'য়ে গেছে। ওর সম্পর্কে আমার লেনদেন (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া)-এর একটা “মেজাজ” (attitude) দাঁড়িয়ে গেছে। সেটাকে উন্টে না দেওয়া পর্যন্ত ওকে আমি তুচ্ছ, জড়, অনাস্থীয়ই ভাবব। ওর সঙ্গে বহিরঙ্গ কারবারটাই হবে ; অন্তরঙ্গ পরিচয়, আশ্বাদটা হবে না।

আমার এই নৈসর্গিক “ধাঁজ ধরণটা” পাণ্টাই কি করে ? আবার সেই ব্রহ্মচারীজীর কথায়—“উলটু যাও”। তোমার চোখের রেটিনাতে যেমনধারা সবকিছুর ছাপ উন্টো পড়ছে তেমনি সব-কিছুর সত্তাই তোমাতে উন্টে যাচ্ছে। সব কিছু উন্টে দেয় এমন আয়নাখানা তোমার। যে “মুখে” সব কিছু তার পরিচয় দেবে, সে-মুখ তোমার পানে “বৈমুখ”। তুমিও বৈমুখ তার পানে। কিছুরই মুখটি দেখতে পাচ্ছ না ; পুচ্ছটি ধরে নাড়ছ ! ঔপনিষদ সেই ‘পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা’ এ নয়। “পুচ্ছ”—যেটা এড়িয়ে যেতে চায়। বিজ্ঞান তুচ্ছের পুচ্ছটি জোরসে চেপে ধ'রেছে। খুব টানছেও দেখছি। কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছে যেন। কই মুখটি খোলে কই ? মুখ হল

‘বৈমুখ’ কেন? কেননা, সব-কিছুর ‘মুখ’ বাইরে আলগ্ আলগ্ মনে হ’চ্ছে; কিন্তু সেটা আসলে একই। কি বলতো সেটা? নিজ অন্তঃপুরে খোঁজ, সে-মুখের পাত্তা লাগবে। তার পাত্তা লাগলে মুখ বলতে সব-কিছুরই পাত্তা লাগবে। কাজেই তুমি আপনার “মুখ”টি আগে দেখে নাও। আয়নাটা বাঁকা থাকতে তা হবে না। তাতে আপনাতে, ওতে, সবতাতে বৈমুখ্যই হ’য়েছে। ওতে ক’রে কারুর মুখোমুখি হতে দিচ্ছে না। রসের যেটা মুখ, জ্যোতির যেটা কেন্দ্র, ছন্দের যেটা সন্ধি তার সঙ্গে সোজামুজি সাক্ষাৎ সম্পর্ক পাতান—রসের জ্যোতির যোগানটা সোজা এসে পৌঁছায়, তার পথ বেঁকে সে এড়িয়ে না যায়—ছন্দে ছন্দে মিতালি করা—একেই বলে মুখোমুখি হওয়া। সমরস, সমজ্যোতি, সমচ্ছন্দ হওয়া। কঠিনতার সেই “অবক্রচেতসঃ” ছাড়া এই ঋজুতা এই সমতাটি আসে কি ক’রে?

তুমি বুটা কারবারে উন্টেই আছ, আপনার ও সবতা’র প্রতি। সাক্ষা কারবার ক’রতে—আবার যাও উন্টে। তার মানে—সিধে হও। উন্টোর উন্টো সিধে। রস-ছন্দঃ-জ্যোতির যোগানটা যত পুরা, অখণ্ড হবে, ততই হবে কারবার সাক্ষা। একেবারে পুরা হ’লে কি “কারবার” বন্ধ? আদার ব্যাপারী তার খবর নিয়ে এখন কি হবে?

তপোবনের দৃষ্টি হচ্ছে যে-দৃষ্টিটা উন্টো তাকে আবার উন্টে সিধে করে নেওয়া। যাই সিধে হ’ল, অমনি সে হ’ল বাঁধনহীন, আবিলতা-হীন, কুণ্ডাকার্পণ্যহীন পরম উদার-দৃষ্টি—সবকিছুতে আলোক, রস আর ছন্দ অব্বেষণ আর উপভোগের দৃষ্টি; যত টুকরা টুকরা রস, আলোক আর ছন্দ—যারা কখনও কাজিয়া ক’রছে, কখনও মিতালি ক’রছে, তাদের সবগুলোকে এক “মহাসংহিতার” (তৈত্তিরীয় শ্রুতির কথায়) সংগতি ও সমন্বয়ের মধ্যে আশ্বাদন করা।

রসসম্পদ, জ্যোতিঃসম্পদ, ছন্দঃসম্পদ—এ তিনটে ক্রমে বেড়ে বেড়ে যাবে—ক্রমে এগিয়ে যাবে এক পরম সুন্দর পরম বৈভবের পানে। এ সাধ্যবস্তুর অবধি, পরাকার্তা কোথায়? এককে তিন ক’রে দেখছি। অপূর্ণতায় যেটা তাদের তফাৎ সেটা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়াতে মিলিয়ে যায়। শক্তিকে আর আলাদা ক’রে বলতে হবে? পূর্ণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে বস্তু, তার হ্রাদিনী শক্তিতে ঐ রস, সম্বিতে জ্যোতি, আর সন্ধিনীতে ছন্দ। বৈষ্ণবের কথা ব’লে আর কেউ নারাজ হো’য়ো না।

তপোবনের দৃষ্টি হচ্ছে সর্বহ্রাদিনী, সর্বসন্ধিনী, সর্ববৈষ্ণবী দৃষ্টি। এইটে কুণ্ঠিত, কুপণ হ’য়ে গিয়েই না ভারত ভেতর-বাইরে সবতাতে ‘সর্বহারা’ হবার মত হ’য়েছে। সব কিছুতে রস, জ্যোতি, ছন্দ ফুটিয়ে তোলার শক্তি তাকে আবার সাধতে হবে। তা হ’লে তার বুকের ওপর এই বিরাট পাষাণের ভারের ‘শাপমুক্তি’ হবে।

আমাদের এই কারবারি দৃষ্টিতে যেটা জড়, তাকেও প্রাণের পুরা ভাগুর ক’রে নেওয়া যায় কি ক’রে তা এই সাধুসন্তেরা নিজেদের সাধনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। বালানন্দজী—তঁার নিজের মুখেই শুনেছি—তঁার প্রথম সাধন জীবনে ‘নর্মদা পরিক্রমা’ করেছিলেন। যে জলন্ত বিশ্বাস, যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে অসামান্য তপশ্বাসহকারে তা, আমরা যারা স্বরাজ সাধনায় লেগে গেছি মনে করি, তাদের যথাশক্তি অনুকরণ করার মতো। নর্মদা তো মধ্য-ভারতের এক নদী। হিন্দুর চক্ষে পবিত্র। উৎপত্তিস্থলে এবং উভয় তটে অনেক তীর্থ ও সাধুসজ্জনের সাধনক্ষেত্র ছিল বা এখনও কতক আছে। তাতে ক’রে এর পাবকতা আরও বাড়িয়ে তুলত বা তুলেছে। কিন্তু বাসু, আমাদের চোখে ঐ পর্যন্ত।

কিন্তু ব্রহ্মচারিজীর নিজ মুখে শুনেছি—এই পুণ্যতোয়া, ভারত-

লক্ষ্মীর কটিতটে গলিত-স্ফটিক-মেথলারূপিণী নৰ্মদাকে তিনি রসঘন, জ্যোতিৰ্ঘন, ছন্দোঘনরূপে সাক্ষাৎকার করেছিলেন। অবশ্য এছাড়া একবার এক বৃদ্ধা আর একবার এক কুমারীর ছন্দবেশেও নৰ্মদামায়ীকে তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু সে-কথা এখন তুলে কাজ নেই। ঐ যে জ্যোতিৰ্ঘন মূৰ্তি—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, পার্থিব সলিল-প্রবাহের মধ্যেও ফোটে—এইটেই আসল কথা। কল্পনা করা নয়, জীবন্ত অনুভূতি! সেই রকম অনুভূতিতেই জড়ের জড়ত্ব গ'লে ভেসে যায়। যেমন দেখি—পরমহংসদেবের পুজো ক'রতে ব'সে অনুভূতি হচ্ছে—কোশাকুশি, ফুলপাতা, মন্দির, দেবতা, গাছপালা সবই চিন্ময়। এক বিশ্বয়সাগরে হিল্লোল খেলে যাচ্ছে; কোথাও বা জমাট বেঁধেও রয়েছে।

ব্রহ্মচারিজী একদিন ধ্যানানুভূতিতে দেখলেন—এক মহাজ্যোতির হিমালয় যেন! স্তরে স্তরে সাজান। স্তরে স্তরে কত দিব্য নর-নারী তাদের অঞ্জলি ভ'রে নিচ্ছে সেই মহাজ্যোতিতে। আর, সেই অঞ্জলি ভরা জ্যোতি ঢেলে দিচ্ছে নিম্নে—ধরণীতলে। অগণিত জ্যোতিভরা অঞ্জলি থেকে বেরিয়ে এল নৰ্মদার পুণ্যতোয়রাশি। যাকে জল ভাবছ সে ত জল নয়, জ্যোতি। শিবসুন্দর, সত্যসুন্দর জ্যোতি। জল-কণিকায় এই অপার্থিব রসজ্যোতিসত্তার দর্শনই তার অন্তরঙ্গ পরিচয়। জলকণায় তড়িৎকণা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এহ বাহ্য। আরও আগে কি আছে দেখ। 'অপ্সু অমৃতম্' সলিলে অমৃত রয়েছে। সত্যি না কি? কই, সন্ধান মেলে কি ক'রে? অপের কাছে প্রার্থনা করছি—'মহে রণায় চক্ষুসে'—সেই পরম রমণীয়টি দেখি কি ক'রে, বাতলাও। কি ঢাকনা দিয়ে, বাপু! তুমি তোমার 'অমৃতের মুখটি' অপিহিত ক'রে রেখেছ, একটিবার খোল—দেখি, সত্যদৃষ্টিতে দেখি—ব্রহ্মচারিজী যেমন ক'রে দেখে-

ছিলেন—যাতে তুমি সত্য সত্য নিজেকে ধ’রে রেখেছ ! তোমার ‘সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ।’

। দুই ।

সে আজ অনেক দিনের কথা। শ্রীমদ্ বালানন্দজী মহারাজ আমায় ব’লেছিলেন—তপোবনের গুহায় গিয়ে ব’সো। ব’সে ভেতরটার গতির মুখটা লক্ষ্য ক’রো। দেখবে—ধারা উণ্টে উজান বইছে। তখন বসা হয়নি। একটানা ভাঁটায় যে চোরাবালিগুলো জেগেছে সেই-গুলোর গ্রাস থেকে পান্‌সিটাকে ঠেকাতে ঠেকাতে পান্‌সিও হ’ল জীর্ণ আর দীর্ণ, আর আমিও হ’লাম নাজেহাল—হয়রাণ ! ঐ গুহার মধ্যে ঢুকে কি উজানের সাঁঝের ‘গোণে’ বরাতটা লাগান যাবে ? আজকে গুহায় বসতে এসেছি, কিন্তু কই বসা ঠিক ঠিক হ’চ্ছে কি ? তবে যেটুকু সংস্পর্শ তার পাচ্ছি, তাতেই মনে হ’চ্ছে, এ যে সর্বগ্রাসী গুহা, এ থেকে পালাব কোথা, কি করে ? গুহা তার বিশ্বরূপটি দর্শন ক’রিয়ে তবে ছাড়বে নাকি ! গুহা যে বিশ্বতোমুখ, বিশ্বরূপ। বিশ্বভুবনে যেখানে যত রূপ—সবই গুহার রূপ। সব কিছু তার মুখটি দেখাচ্ছে, কায়াকাটা রাখছে লুকিয়ে ; তার রাস্তা ফাগের পিচকারি দিচ্ছে অচেনার আড়াল থেকে। তার চোরা হোলিখেলায় সব কিছু দিচ্ছে রাস্তিয়ে।

আচ্ছা, গুহা কি শুধু এই তপোবনে ? গুহা নেই কোথা ? তাই আগে বল। সব কিছুর যেটা সত্তা আর শক্তি—তাদের আলাদা ক’রেই এখন ব’লছি—এক একটা গুহা বানিয়ে তাতেই গুহাবাসী হ’য়ে র’য়েছে। গুহা আড়ষ্ট গুহা নয়। যাকে অচলায়তন বলে তা নয়। কখনও ছোট হচ্ছে, কখনও বড় হচ্ছে। তার

লক্ষ্মীর কটিতটে গলিত-ফটিক-মেথলারূপিণী নৰ্মদাকে তিনি রসঘন, জ্যোতিৰ্ঘন, ছন্দোঘনরূপে সান্ধাৎকার করেছিলেন। অবশ্য এছাড়া একবার এক বৃদ্ধা আর একবার এক কুমারীর ছদ্মবেশেও নৰ্মদা-মায়ীকে তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু সে-কথা এখন তুলে কাজ নেই। ঐ যে জ্যোতিৰ্ঘন মূৰ্তি—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, পার্থিব সলিল-প্রবাহের মধ্যেও ফোটে—এইটেই আসল কথা। কল্পনা করা নয়, জীবন্ত অনুভূতি! সেই রকম অনুভূতিতেই জড়ের জড়ত্ব গ'লে ভেসে যায়। যেমন দেখি—পরমহংসদেবের পূজো ক'রতে ব'সে অনুভূতি হচ্ছে—কোশাকুশি, ফুলপাতা, মন্দির, দেবতা, গাছপালা সবই চিন্ময়। এক বিশ্বয়সাগরে হিল্লোল খেলে যাচ্ছে; কোথাও বা জমাট বেঁধেও রয়েছে।

ব্রহ্মচারিজী একদিন ধ্যানানুভূতিতে দেখলেন—এক মহাজ্যোতির হিমালয় যেন! স্তরে স্তরে সাজান। স্তরে স্তরে কত দিব্য নর-নারী তাদের অঞ্জলি ভ'রে নিচ্ছে সেই মহাজ্যোতিতে। আর, সেই অঞ্জলি ভরা জ্যোতি ঢেলে দিচ্ছে নিম্নে—ধরণীতলে। অগণিত জ্যোতিভরা অঞ্জলি থেকে বেরিয়ে এল নৰ্মদার পুণ্যতোয়রাশি। যাকে জল ভাবছ সে ত জল নয়, জ্যোতি। শিবসুন্দর, সত্যসুন্দর জ্যোতি। জল-কণিকায় এই অপার্থিব রসজ্যোতিসত্তার দর্শনই তার অন্তরঙ্গ পরিচয়। জলকণায় তড়িৎকণা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এহ বাহ। আরও আগে কি আছে দেখ। 'অপ্সু অমৃতম্' সলিলে অমৃত রয়েছে। সত্যি না কি? কই, সন্ধান মেলে কি ক'রে? অপের কাছে প্রার্থনা করছি—'মহে রণায় চক্ষুসে'—সেই পরম রমণীয়টি দেখি কি ক'রে, বাতলাও। কি ঢাকনা দিয়ে, বাপু! তুমি তোমার 'অমৃতের মুখটি' অপিহিত ক'রে রেখেছ, একটিবার খোল—দেখি, সত্যদৃষ্টিতে দেখি—ব্রহ্মচারিজী যেমন ক'রে দেখে-

ছিলেন—যাতে তুমি সত্য সত্য নিজেকে ধ’রে রেখেছ ! তোমার ‘সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ।’

। দুই ।

সে আজ অনেক দিনের কথা। শ্রীমদ্ বালানন্দজী মহারাজ আমায় ব’লেছিলেন—তপোবনের গুহায় গিয়ে ব’সো। ব’সে ভেতরটার গতির মুখটা লক্ষ্য ক’রো। দেখবে—ধারা উর্নেট উজান বইছে। তখন বসা হয়নি। একটানা ভাঁটায় যে চোরাবালিগুলো জেগেছে সেই-গুলোর গ্রাস থেকে পান্‌সিটাকে ঠেকাতে ঠেকাতে পান্‌সিও হ’ল জীর্ণ আর দীর্ণ, আর আমিও হ’লাম নাজেহাল—হয়রাণ ! ঐ গুহার মধ্যে ঢুকে কি উজানের সাঁঝের ‘গোণে’ বরাতটা লাগান যাবে ? আজকে গুহায় বসতে এসেছি, কিন্তু কই বসা ঠিক ঠিক হ’চ্ছে কি ? তবে যেটুকু সংস্পর্শ তার পাচ্ছি, তাতেই মনে হ’চ্ছে, এ যে সর্বগ্রাসী গুহা, এ থেকে পালাব কোথা, কি করে ? গুহা তার বিশ্বরূপটি দর্শন ক’রিয়ে তবে ছাড়বে নাকি ! গুহা যে বিশ্বতোমুখ, বিশ্বরূপ। বিশ্বভুবনে যেখানে যত রূপ—সবই গুহার রূপ। সব কিছু তার মুখটি দেখাচ্ছে, কায়টা রাখছে লুকিয়ে ; তার রাজা ফাগের পিচকারি দিচ্ছে অচেনার আড়াল থেকে। তার চোরা হোলিখেলায় সব কিছু দিচ্ছে রাসিয়ে।

আচ্ছা, গুহা কি শুধু এই তপোবনে ? গুহা নেই কোথা ? তাই আগে বল। সব কিছুর যেটা সত্তা আর শক্তি—তাদের আলাদা ক’রেই এখন ব’লছি—এক একটা গুহা বানিয়ে তাতেই গুহাবাসী হ’য়ে র’য়েছে। গুহা আড়ষ্ট গুহা নয়। যাকে অচলায়তন বলে তা নয়। কখনও ছোট হচ্ছে, কখনও বড় হচ্ছে। তার

কাঠামোটা “ইস্পাত কাঠামো” নয় সত্যি। তবু সেটা গুহাই থেকে যায়। বটের বীজ একটা খুব “জমাট” গুহা। অন্ধুর হ’ল, চারা হ’ল তা থেকে। কিন্তু গুহাহ ঘুচল না। এক বিঘে জায়গায়ও গাছ রইল গুহা। তার প্রতি জীবকোষে তার প্রতিটি দানায় সে আছে গুহাবাসী।

“গুহা” ব’লতে কি বুঝি ? মূলে তিনটে জিনিস। একটা গণ্ডী-বাঁধনের ভেতরে কেউ বা কিছু যেন ধরা দিয়েছে। তাতে করে তার একটা নির্দিষ্ট আয়তন আর পরিমাণ হয়েছে। দ্বিতীয়—তার ভেতরে সে যতটা পারে জমাট হ’য়ে থাকে। আর যেন একটা ব্যূহের ভেতর থেকে বাহিরের সঙ্গে কারবার করে। খানিকটে থাকে প্রকাশ্যে, অনেকটা নেপথ্যে। খানিক ব্যক্ত, খানিক অব্যক্ত। একটুখানি ফুটে, বাকিটা যেন অ-ফোটা। তৃতীয়—তার প্রকাশ্য আর নেপথ্য—এই দুটো দিক, আর যাদের সঙ্গে কারবারে এই রকম ছ-কুঠুরি গুহা ফেঁদে সে ব’সে আছে, এই তিন ব্যাপারীর বনিবনা ঠিক হচ্ছে না ব’লে, একটা রফা-নিষ্পত্তি হচ্ছে না বলে, তার গুহা-বাসেও একদণ্ড “শান্তি” নেই। বাইরকেও করতে হচ্ছে অবিশ্রান্ত আনাগোনা তার সদরে অন্দরে ; তাকেও হামেশা বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। সমতা, সামঞ্জস্য হচ্ছে না, হলে কি আনাগোনার ছুটি হত ? যা হোক, গুহা হ’তে গেলে ভেতর-বাইরের তফাৎটা থাকা চাই। কিছু আত্মসাৎ করে নেওয়া চাই, কিছু বাহিরে ঠেলে দেওয়া চাই। নিজের দেনা-পাওনা এক রকম করে বুঝে নেওয়া চাই। গুহা কত রকমের হয় দেখবে ? একরকম হচ্ছে আমাদের “আর্টপোরে” চলতি গুহা—যে-রকম গুহায় থেকে আর যে-রকম সব গুহার সঙ্গে আমাদের এই সাধারণ মামুলি কারবারটা চলছে। ঐ একখানা পাথর। আর দশবিশখানার মধ্যে ঐ একখানা। ওর যেটা সন্তা

আর যেটা শক্তি—ওর যথাসর্বস্ব—তা দিয়েও যেন ওখানেই পড়ে আছে। ওখানটায় আছে, এখানটায় নেই। ওর যা কিছু ভাঁড়ার তা সে আটকে আগলে র'য়েছে আপন গণ্ডীটার ভেতর। এখন পর্যন্ত সে-ভাঁড়ার সে খুলে দেয়নি মনে হচ্ছে। সত্যিই দেয়নি কি? না দিলে ওকে আমি দেখছি কি ক'রে—এখান থেকেই? তার সন্তাটাকে যেমন ক'রেই দেখি না কেন, তার শক্তিগুলো যে ঐ কালো নিরেট গুহার ভেতরেই চুপটি ক'রে ধ্যানস্থ হ'য়ে নেই; তার যা কিছু কারবার, লেন-দেন, সত্যি যে একান্ত ভাবে “ঘরোয়া” নয়—ঐ “আঁটসাঁট” আপন কুঠুরিটার ভেতরেই সমাধা হ'য়ে যাচ্ছে না—তা আমরা একটুখানি নজর রাখলেই ধরতে পারি, পারি না? কিন্তু চলতি কারবারের মুখে সে খেয়ালটুকু সচরাচর আসে কই? তাই ভাবি, পাথরটা তার খাস গুহাটার ভেতরেই খাসা অজগরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে আছে। আমাদের চলতি হিসেবে যেগুলো অনড়, আড়ষ্ট “জড়” সেগুলোকে এরকমধারা এক একটা আলাদা নম্বরী ‘সেলে’ শেকল-বাঁধা প'ড়ে থাকতে দিয়েছি। জড়ভরত হ'য়ে প'ড়ে থাকা ছাড়া ওর কি কোন কর্ম আছে? যদি কিছু থাকে তো কয়েদীর মত ‘সেলে’ আটকা থেকেই তাকে তার সর্বকর্ম সমাধা ক'রতে হচ্ছে। এটাকে বলা যাক—জড়গুহা। অথবা, ঐ পাষাণের নামে, পাষাণী গুহা।

একটা দেখার ভুল, বোঝার ভুল, হিসেবের ভুল নিয়েই পাষাণী-গুহা বর্তে রয়েছে। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে সে-ভুল ধরিয়ে দেয়। তখন পাষাণী গুহা আর একটা কিছু হ'য়ে যায়। হয়তো-বা শেষ পর্যন্ত, গুহা বলতে যা বুঝি—তাই আর থাকে না। অজ্ঞানের দেখা, অদরদী অমরমী যে দেখা—তাই হ'ল পাষাণীর শাপ। আমার ভিতর থেকে “জ্যোতির” চোখ, “রসের” চোখ, “ছন্দের” চোখটি

যেমন যেমন ফুটতে থাকবে, ততই হবে পাষাণীর শাপমুক্তি। ভেতরে “রাম” উষ্টে “মরা” হ’য়ে রয়েছে যে! মরার স্পর্শে সবই কিছু মরে আছে। রামের স্পর্শটি পেলে তবে সে বাঁচবে। কথা-গুলো হেঁয়ালি ক’রে এখানে বললাম। দেখি, পরে যদি পরিষ্কার করতে পারি একটুখানি।

আমার হচ্ছে দুটো কাঠি নিয়ে কারবার। একটা জীওন-কাঠি, একটা মারণ-কাঠি। মারণ-কাঠি ছুঁইয়ে এই বিশ্বভুবনটাকে মরা ক’রে রেখেছি। ছুঁচারটে বস্তুতে জীওন-কাঠির স্পর্শ লেগেছে বৈ তো নয়—সেগুলোকে বলি প্রাণী, জীব। মরণের অনন্ত মরুমাঝে প্রাণের ঐ দুইচারি কুণ্ঠিত বিন্দু। আচ্ছা, এই দো-কাঠির ভেঙ্কি খেলাতেই শুরু করেছি। দেখি কদু’রে গিয়ে দাঁড়ায়!

জড়, পাষাণী গুহা একটা ‘টাইপ,’ সাধারণ নাম-রূপ। অনেক কিছুই এর ভেতর পড়ে। ব্যবহারে যেগুলোকে “অনড়, আড়ষ্ট, অসাড়” এইরকম ক’রে পাই, সেইগুলোকে ফেলি এই ‘টাইপে’র ভেতর। কারবারে জিনিসগুলোকে তিনটে “মূর্তি”তে পাই। একটা হচ্ছে ফোটার দিক, একটা নড়া-চড়া, চলাফেরার দিক, আর একটা হচ্ছে গর্তে কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মতন অসাড় প’ড়ে থাকার দিক। যেগুলোকে পাষাণের মত ভাবি, সেগুলোতে ঐ ফোটার দিক আর চলার দিক যেন বন্ধ মনে হয়। সব কিছুই আছে কিন্তু তিনটে দিকই। তলিয়ে দেখতে জানলে সত্যিই আছে। কিন্তু চলতি কারবারে, দুটো মুখ হয়তো বন্ধ হ’য়ে গেছে। একটা মুখ শুধু খোলা। কেন এমন হচ্ছে তা ভেবে দেখবার।

ঐ পাষাণী “টাইপে” ফেলি অনেক কিছু। সাধন-ভজন করছি, কিন্তু তাতে “প্রাণ” নেই। শুধুই কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানের “ঘানিগাছে” ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছি। চোখে ঠুলি; হৃন্দের সাড়া

ভেতরে বাইরে কোথাও নেই ; রসাস্বাদের গন্ধটুকুও নেই । একটা সমাজ, একটা জাতি, এমন কি, একটা যুগ তার বিকাশ, উন্নতি, অভ্যুদয়ের মুখটা পেল পাথরচাপা ; কাজেই, কি করে—একটা গুহার ভেতর সৈথিয়ে লাগল ক্রমাগত বাঁধি খাতে, বাঁধি গতে পাক খেতে । অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়সের জায়গায় পেল, শুদ্ধ গতানু-গতিকতার বাঁধন । গুহায় অবিরত পাক খেতে খেতে তাতে এল বক্রতা, আবিলতা, আড়ষ্টতা—শেষকালে স্তব্ধতা । এই আড়ষ্টতা, স্তব্ধতার নাম দিয়ে বসল—তিতিক্ষা, উপরতি, শাস্তি ! কিন্তু সে ততক্ষণ আসলে একটা দস্তুরমত পাষণ ব'নে গেছে । আপন জ্যোতি, আপন রস, আপন ছন্দের যে ক্রমবর্দ্ধিযু কার্পণ্য, সেই কার্পণ্য-দোষোপহত স্বভাব হ'ল তার সন্তার পাষাণী শাপ । যাই কিছু করনা কেন—নিজে অথবা দশে মিলে—অনবরত খোঁজ নাও, ঐ তিনটার মুখগুলো খুলে যাচ্ছে কি বুঁজে যাচ্ছে । ঐ আলোর মুখ, রসের মুখ, আর ছন্দের মুখ । বুঁজে গেলে ঐ পাথরখানাও যেমন গুহা, আমিও তেমনি গুহা, আমার দেহ-গেহ, ধর্ম-কর্ম, জাতি-সমাজ, সংস্কৃতি-সভ্যতা সব কিছুই পাষাণী গুহা । আমি হই বন্দী তার ভেতর ; সেও হয় আমার বন্ধন । আমি সে-সবের ভেতরে থেকে রই না লীলারসিক, তারাও আমাকে ঘিরে ধরে হয় না আমার লীলা-সহচর, লীলা-সাধক । “লীলা” মানে যা-খুশি তাই নয় । “লীলা” মানে—কোন কিছুর ভেতর আলো আর রসের (একেরই ছোটো দিক্) যে অফুরন্ত ফোয়ারা, সেই ফোয়ারাটাকে ফুটে উঠতে দেওয়া, ক্রমে পরিপুষ্ট সত্য, শিব, সুন্দর ছন্দে । ওদের ফোটার ছন্দ হবে ক্রমে পূর্ণতর, সুন্দরতর । টুকরো টুকরো ছন্দগুলো ক্রমে একটা অখণ্ড শোভন ছন্দে গাঁথা পড়ে যেতে থাকবে । কোন রাগ-রাগিণীর আলাপে তানগুলো ফেঙড়ার মতো এখানে সেখানে

লীলায়িত হ'য়ে বেরিয়ে গিয়ে গানের মূল রূপ যেটা, তাকে যেমন-ধারা সমৃদ্ধ করে, সুন্দর করে, আপ্যায়িত চরিতার্থ করে তেমনিধারা।

সাধন-ভজনের তরফ থেকে একটা নমুনা দেব নাকি ? বটচক্র-ভেদ একটা মস্তবড় সাধন। কোন না কোন আকারে এটাকে রহস্য-সাধনরূপে প্রায় দেশেই দেখতে পাই। এর গোড়ার কথা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এ শক্তিকে শুধু একটা ঠাই আটকে রাখলে চলবে না। জড়ে, প্রাণে, মনে সর্বত্র ছোট-বড় সকল “ঘটে” এ শক্তিকে চিনে নিতে হবে। একটা এ্যাটমের ভেতর তার কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে অজস্র সত্তাশক্তির একটা ভাঁড়ার রয়েছে। এটা হচ্ছে তার মজুদী ভাণ্ডার। কেন্দ্রকে আশ্রয় করে তার চারধারে খানিকটা শক্তি খাটছেও, তাকে না হয় বলা যাক—কারবারী শক্তি। এ মজুদী আর কারবারী শক্তি দেখব সবতাতেই। প্রাণীদেহের যেগুলো কোষ, বিশেষ করে যেগুলো বীজ-কোষ, সেগুলোতেও এইরকম-ধারা মজুদী আর কারবারী শক্তি দেখতে পাই। মনের মূলুকে এসেও দেখতে পাই। মন তার ভাঁড়ার থেকে—সেটাকে এদেশের দস্তুরমত ‘চিত্ত’ই বল আর ওদেশের দস্তুর মত ‘সাব-কনসাস মাইণ্ড’-ই (sub-conscious mind) বল—সামান্য একটু মাল বের ক’রে নিয়ে ‘স্টল’ সাজিয়ে কারবার ক’রছে। বাকি মাল সব গুদামজাত। এ ছাড়া জড়, প্রাণ, মনের যে-সমস্ত মোটা মোটা সম্ভব রূপ, সেগুলোতেও এই বন্দোবস্ত দেখা যাবে। একটা জাতি, একটা সমাজ, একটা রাষ্ট্র, তার যা কিছু শক্তি-সম্ভার, তা সে ষোল আনা প্রকাশে খাটছে না। অনেকটা নেপথ্যে, আড়ালে রাখে। সেইটে তার মজুদী শক্তি। দেহে কঠিন রোগ পীড়া হ’লে ওষুধ-পালার ওপর ততটা ভরসা করা যায় না, যতটা ভরসা ক’রতে হয় দেহের মজুদী শক্তির ওপর।

সব কিছুর ভেতর ঐ মজুদী শক্তিই হচ্ছে কুণ্ডলিনী শক্তি।

যেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত শক্তি। অথচ যে শক্তিটা সজাগ বা জাগন্ত, সেটা এই ঘুমন্ত শক্তির উপর সব রকমে নির্ভর করে। জাগন্ত শক্তি এতটুকু ; ঘুমন্ত শক্তি যে কতখানি, কত বড়, তার মাপ মেলা ভার। রেডিও-একটিভ (radio-active) একটা এ্যাটমের নমুনা নিয়ে দেখ। শক্তির ভাঁড়ারটা শুধু ঐ রকম ছ'চারটে সামগ্রীতেই বিপুল ভেব না। মনের যেটা মগ্ন-চেতনার ভূমি, সেটা হচ্ছে একটা বিশাল 'ম্যাগাজিন' (magazine), কত গভীর তার মাপ হিসেব হবে না। এ দেশের যেটা আর্থ-বিজ্ঞান, তাতে দেখি—একটা ধুলোবালির ভেতরও স্বয়ং ব্রহ্ম (যার চাইতে বিশাল, মহান্ আর কিছু নেই) “অনুপ্রবেশ” করে গৃহবাসী হয়ে আছেন। অর্থাৎ, ঐ ধুলোবালিটার ভেতরেও সত্তাশক্তি আসলে পরিচ্ছেদহীন। ব্যবহারে, কারবারে সেই পরিচ্ছেদ-পরিমাণ-হীন সত্তা “এতটুকু” হয়ে গেছেন। কারবারী আর মজুদী সত্তার মধ্যে একটা “সলা-পরামর্শ” হয়ে সব কিছুর দিন-গুজরান হচ্ছে বটে। তবু ঐ ছয়ের ভেতর যোগটি, সন্ধিটি পুরা হয়ে নেই। ভেতরে বয়লারে স্তীম জমা আছে—কে জানে কত বিপুল “প্রেসারে”! পাইপে করে সে স্তীম জোগাচ্ছেও বটে কলকজাগুলোতে। কিন্তু কারিগর পাইপের মুখে জব্দ করে ‘ভালব্’ (valve) এঁটে দিয়েছে। কারিগর মানে ধর—নৈসর্গিক অবস্থা-ব্যবস্থা। ‘ভালব্’ টিপে টিপে একটু একটু করে স্তীম জোগান দেয়। চলতি কারবারে সাধারণ নৈসর্গিক বন্দোবস্তে—যতটুকু দরকার ততটুকু জোগান দিচ্ছে। আটপৌরে কারবার তাতেই একরকম চ’লে যাচ্ছে। কিন্তু চাহিদা তেমন বেশি হলে মুক্ছিল। ‘ভালবে’র ফাঁক দিয়ে তার জোগানটি ঠিক হ’য়ে ওঠে না। তখন ‘ভালব্’ বদলাতে হয়। বেশি বেশি জোগান দেয়—এমন ভালব্।

জীবনে শক্তির জোগানটি বড় হ'তে গেলে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে আমার এই “কলকজা”গুলোর যোগটা বেশি করে নিতে হয়। যাতে ক'রে মজুদী শক্তির ভাঁড়ার থেকে প্রচুর মাল সরবরাহ হ'তে থাকে তাই ক'রতে হয়। যেটাকে ‘ভালব্’ ব'লছিলাম এ দেশের রহস্যসাধন তাকে বলেন—রক্ত, বিবর ইত্যাদি। রক্তটা সরল সিধে হয়ে নেই। তাতে সাধারণ কারবার চালানো-গোছ—একটা ‘ভালব্’ ঝাঁটা র'য়েছে। সাধারণ কারবার হচ্ছে চুনোপুঁটির কারবার। তাতে আখেরে লাভের কড়ি সামান্য, পেট ভরে না, মনও গুঠে না। কারবার বড় করে ফাঁদতে হবে—রুই-কাতলার “চাষ” আর “চালানী” কারবার। তাতে মুনাফা বিস্তর। বড় কারবারী হ'তে হ'লে আপন মজুদী আর কারবারী শক্তির মাঝখানে জোগান পথটা সরল করে নিতে হয়। পুঁজি তো আমার লম্বাই গুনছি। খেলছি কাণাকড়ি নিয়ে। পুঁজিতে ইচ্ছেমতো হাত দিতে পারিনে—এই তো আপশোষ! পুঁজি হাতের কাছে ঠেলে দেবার সুরাহা হ'লে আমার পোয়াবারো! সেইটে হয় কি ক'রে—তার ফিকিরই হচ্ছে সাধন। শুধু কি আধ্যাত্মিক জীবনে, ব্যবহারিক জীবনের কাজেও গড্ডালিকা সারের বাইরে একটা কিছু হ'তে বা করতে গেলে, চাই ঐ কুণ্ডলিনীকে জাগানোর ফিকির। ফিকির, কৌশল, অন্ধি-সন্ধি-ফন্দি—এ সবগুলো কথাই “সস্পেক্ট” (suspect) চোরা অপবাদ পেয়েছে দেখছি। কিন্তু আসলে, কুশলের ভাব হচ্ছে কৌশল। আর সেই কৌশলই হচ্ছে যোগ। তাই কুণ্ডলিনী যোগ সব রকম সাধনেরই গোড়ার কথা। কুণ্ডলিনী না জাগলে হল না কিছু। দেশ-মায়ের যা কুণ্ডলিনী রূপ, সেটা না জাগলে দেশ জাগে না, বড়ও হয় না। তলায় খানিকটে সত্তা আর শক্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে “ঘুমিয়ে” র'য়েছে ব'লেই না সব কিছু হ'য়েছে এক একটা

গুহার মতন! তার গুহা ভেঙ্গে তাকে বড় হ'তে গেলেও ভেতরকার কুণ্ডলীগুলো, গাঁটগুলো, কতক খুলতেই হবে। যাতে করে বাঁধন, তাতে করেই মুক্তি—তবে, ব্রহ্মচারিজী যেমন বলতেন—উপ্টো প্যাঁচে।

আচ্ছা তা না হয় হ'লো। ভেতরের ঐ চক্রগুলো? ওগুলো হচ্ছে পর পর বড়, পূর্ণতর ছন্দের ভূমি। প্রত্যেকটাই এক একটা ছন্দের ভূমি। ছন্দের প্রকাশ তিনটেতে। একটা হচ্ছে তার শব্দ বা বাণীরূপ। একটা হচ্ছে মূর্তি বা “আকার” রূপ, আর একটা হচ্ছে তার ক্রিয়ারূপ। ভেতরে যেটা শক্তি-সংঘাত, organisation of forces (অরগ্যানিজেশন অব ফোর্সেস) তারই তিন দিক দিয়ে তিনটে রূপ। একটার সঙ্গে আর দুটো আছেই। মূলে ঐ শক্তি-ব্যুহটা থাকলেই এই তিন রকমে তাকে পাব। ধর, একটা রাগ বা রাগিণী। তার একটা খাঁটি বাণীরূপ আছে—উপযুক্ত যন্ত্রে অথবা সিদ্ধ গুণীর কণ্ঠে তার “সারিগমের” আলাপনে পাই তার বাণীরূপ। রূপটি যদি একান্তভাবে নিখুঁত হয়, পুরা হয়, তবে, সুররূপের সঙ্গে পাব—নিশ্চয়ই পাব—তার সেই রাগ বা রাগিণীর ধ্যান-মূর্তি। আর পাব তার ক্রিয়ারূপ—দীপক, মেঘ, কর্ণাটক ইত্যাদির যে যে ক্রিয়া, যে যে সিদ্ধি আগুবাক্যে শ্রুত হয়েছে সেই সব। তবে, সুররূপটি শুদ্ধ হওয়া চাই, পুরা হওয়া চাই। ঠিক তা হয় কই? এখন, এক একটা চক্র বা পদ্যে কয়টি করে বর্ণের সন্নিবেশ শুনতে পাই। যেমন, মূলাধারে চারটি, স্বাধিষ্ঠানে ছয়টি, ইত্যাদি। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান এদের আশ্রয় করে, অথবা এদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ হ'য়ে, যে যে ছন্দ—রিদম (rhythm) রয়েছে, তাদের “সারিগম”। ‘সা’ ‘ঋ’ মুখে এমনি বল্লই শুদ্ধ, পুরা ‘সা’ ‘ঋ’ স্বর হয় কি? তা হয় না। তেমনি, অ,

আ, ক, খ এসব মুখে এমনি বল্লই তাঁদের খাঁটি রূপটি মেলে না। আমাদের গলায় বর্ণের বিকৃতিগুলোই বেরোয়, তাদের যেটা “প্রকৃতি” সেটা আসে না। ধ্বনির টুকরো বেরোয়, গোটা পুরা ধ্বনি বেরোয় না। স্বর খানিকটে অফোটা থেকে, খানিকটে মিশেল, ভেজাল হয়ে, আমাদের কাছ থেকে আদায় হচ্ছে, তাই না হচ্ছে গানে ঠিক ঠিক সুরচ্ছন্দের আদায়, না হচ্ছে জীবনের আর কিছুতে। একটা চক্র বা পদ্মের ঠিক ঠিক বাণী বা শব্দরূপ হচ্ছে তার বর্ণবিজ্ঞাসের ‘সারিগম’। ওর “পারফেক্ট্ ফোনোগ্রাফ” (perfect phonograph) পদ্মের দল ইত্যাদি হচ্ছে তার আসল মূর্তিরূপ—ঠিক ঠিক ফটোগ্রাফ (photograph)। আর তার যে ক্রিয়া, তাতে যা সিদ্ধি হয় শুনি, সেটা হচ্ছে তার ঠিক ঠিক কায়নোগ্রাফ (keino-graph)।

এইরকম ধারা ছন্দের ধাপের পর ধাপ বেয়ে ছন্দের যে পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছতে হয়, সেইটে হচ্ছে সহস্রারের বৈঠক। সেখানের ভেতরের বাইরের যতযত সব টুকরো টুকরো ছন্দ—কোনটা কারুর অরি, কারুর বা মিত্র—এসে একটা পূর্ণতার মধ্যে তাদের চরিতার্থতা লাভ করে। একটা পরম মধুরিমায় পৌঁছে তাদের নিখিল কুণ্ঠা, কার্পণ্য, দৈন্ত, বিরোধের অবসান। এখানে কি শুধু ছন্দেরই পরিপূর্ণতা?

সেই জ্যোতি আর রসের কথা আবার মনে কর। ছন্দ পরিপূর্ণ হ’লে জ্যোতি-রসও হবে পরিপূর্ণ। আচ্ছা, পরিপূর্ণের কথা না হয় এখন ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তারইর দিকে ব্যষ্টির সমষ্টির সকল প্রয়াস, সকল সাধনাকে এগিয়ে যেতে হবে তো! তার মানে, যত এগোন যাবে ততই অনুভূতিতে পাওয়া যাবে—ছন্দকে পূর্ণতার সমৃদ্ধতর রূপে; জ্যোতিকেও তাই, রসকেও তাই। তাই নয় কি?

একটা গুহা ছেড়ে আর একটা গুহায় ঢোকা ছাড়া উপায় নাই

—পথ চলতে গিয়ে। যেটায় ছেড়ে এলাম তাতে আলো কি একটু বেশি, রস আর ছন্দ আরও একটু গাঢ় হ'ল, শুদ্ধ হ'ল, ব্যাপক হ'ল, সমৃদ্ধ হ'ল? অনেক সময় একটুখানি বেশি আলো রস আর ছন্দ ধরতে পেলেই তাতে যেন মশগুল হয়ে ডুবে যাই। তার ভেতরেই এক রকমের নিশ্চেষ্টতা, আড়ষ্টতা এসে পড়ে। তখন সেইটেই হ'য়ে যায় একটা জমাট গুহা। ঐ পানানী গুহারই একটা যেন “এনলাইটেড এডিশান” (enlightened edition)—উচ্চ সংস্করণ। আধ্যাত্মিক সাধনের পথে কেউ কেউ দেখি—এই রকমের এক-একটা “দিব্য” গুহায় নিশ্চিতভাবে আটকা প'ড়ে গেছেন। একটা অলৌকিক রূপ-টুপ দেখছেন; “দশা” বা ভাবের মতো কিছু একটা হচ্ছে; গাঢ় একটা রসে বেশ মশগুল হ'য়ে আছেন,—ইত্যাদি। ব্যবহারক্ষেত্রেও এইরকম সব উঁচু উঁচু গুহা-বাসী জীব মিলবে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজনীতি—যেদিকে তাকাও, ওপরে, নীচে, থাকে থাকে গুহার সার দেখতে পাবে। খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, অজন্তা, এ সব জায়গাতে যেমন নানান ভিক্ষু সন্ন্যাসীর দল থাকতো—এই সমস্ত নানান থাকের, নানান ধাঁচের গুহাতে, তেমনি বাস করে কত-না মতবাদ, কত-না ইডিওলজি (ideology), কত-না মার্গ আর পন্থা! এরা পরস্পরের টুকরো টুকরো ছন্দগুলো মিলিয়ে নিতে পারছে কই? তার জন্তে যত্নই বা কই? এমন কি তাতে শ্রেয়োবুদ্ধি, প্রেয়োবুদ্ধিই-বা কই তেমন? প্রত্যেকে আপন গুহাটিতেই সব কিছুই পরিসমাপ্তির নেশায় বুঁদ হ'য়ে আছেন যেন!

ব্রহ্মচারিজী প্রায়ই বলতেন বটে—“এক সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়”! একটা ধরেই সাধতে হবে বটে। কিন্তু “সাধতে” হবে, একটাতে “বৈধে” গেলে হবে না তো। কেন্দ্রের পানে—

মূল প্রস্রবণের দিকে—এগিয়ে যেতে হবে, একটাতে শুরু ক'রে। সেই একটার ভেতর আর তাকে ঘিরে—সব ফুটে উঠতে দিতে হবে। পাষাণী গুহা নয়, বন্ধ গুহা নয়, পদ্ম-গুহা হবে সেটা।

খুলনায় বাঁশবন ডোবার ভেতর কুঁড়েটায় যখন বসি, তখন ঐ বাঁশবন, ডোবাগুলো থেকে একটা অশরীরী কঙ্কালসার বিকট দৈত্য বেরিয়ে এসে আমার প্রাণের ঝরণাটার মুখ চেপে ধরে। দম আটকে আসে যেন। প্রাণ চারধারে নিজেকে ছড়াবে কি, অবসাদ, দৈন্ত, মৃত্যু চারধারে জড়ো হ'য়ে তাকে দাবিয়ে রাখে যেন। গুহাটি আমার পাষাণের মতোই হ'য়ে যায়। এখানে চারধারে শালবনের ভেতর একটা পাষাণে এসে বসেছি। শালবনের এই মধুমাसे নতুন কচি পাতাগুলো শুকতা, রুদ্ধতার ভেতর থেকে মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। বিকাশের উন্মেষের অপরূপ সজীবতার হিল্লোলে আমি আপনার আড়ষ্টতার মাঝে ঠিক চূপ ক'রে থাকতে পারছি কই, এই পাথরটার মতো? আড়ষ্টতা কি ঘুচবে? চারধারে এই সুরের জলসায় আপনার ছন্দটা মিলিয়ে নিতে পারবে? না, শবের শ্মশানে শব-সাধনায় প্রাণকে পেতে হবে? মরণের মাঝে শুনতে হবে প্রাণের সুর?

। তিন ।

আবার পাথরের কথা; পাথরের রাজ্যে, পাষাণের তলেই কি সকল কিছুর ঝর্ণার সন্ধান মিলবে? পাষাণের তলেই থাকে তারা ঘুমিয়ে, আবার পাষাণের চাপ সরিয়ে ওঠে তারা জেগে। ঐ যে সব নদনদী ছুটেছে সাগর-পানে, তাদের গোড়া খুঁজতে খুঁজতে চল, শেষ পর্যন্ত পৌঁছুবে পাষাণের তলে। এই যে ঝরা-পাতা শালবন

আবার নতুন কচি কচি 'পাতাগুলো মেলে, আকাশে বাতাসে এত রূপের ঢেউ, এত বাসের ঢেউ ছড়িয়ে দিল, এরই বা প্রাণের ফোয়ারা এতদিন কোথা ঘুমিয়েছিল, আজকে আবার জাগলই বা কোথা থেকে? ঐ শুকনো নিরেট পাথরখানার ফাটলে কি সুন্দর ক'টা ছোট ফুল ফুটেছে, দেখেছ! পাথরের ফাটলে এতদিন সে লুকিয়েছিল। কবে জাগবে, ফুটবে, কবে তার বিকাশ-উন্মেষ হবে, এই নিগূঢ় সঙ্কেত, এর অজ্ঞাত রহস্যটুকু হ'য়ে সে এতদিন লুকিয়ে ছিল। তার বীজের কথা, লতাটার মূল শেকড়ের কথা ভাবছ? কিন্তু বীজ বলতে যা ফুটবে, তার একটা সঙ্কেত, একটা রহস্য বৈ আর যে কি ব'লব তাতো বুঝে পাইনে। শুধু ঐ ছোট্ট ক'টি ফুল? এই শালবনের রস, এর মধু, এর প্রাণ এই পাষাণের তলেই ঘুমিয়ে ছিল যে! আজকে কিসে, কেমন ক'রে তাদের ফোয়ারা-গুলো খুলে গিয়েছে! তাই চারধারে প্রাণের এমন মধু শিহরন, রূপের, রসের, বাসের, পরশের এত বিচিত্র বিপুল হিল্লোল! এ রুক্ষ পাথরের দেশ ছেড়ে বাঙলা মায়ের কোলের নমনীয়তা কমনীয়তার কথা মনে প'ড়ছে বুঝি? কিন্তু ভুলে যেও না—বাঙলার যে নরম পলিমাটি তাকে এই সব পাথুরে দেশের পাষাণী তিলোত্তমার মত তিলে তিলে গ'ড়েছে আপন বুকের গভীর গোপন স্নেহের ধারায় আপনার বুক, আপনার কলিজে গলিয়ে গলিয়ে! বর্ষাগমে এই পাহাড়-পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে আসে ছুটে, চকিত-চঞ্চল পায়ে বালতপস্বী যত সরিতের দল তাদের দীপ্তস্নিগ্ধ গৈরিকের বাসে। বাঙলার মাঠে গোষ্ঠে যখন তারা এসে দেখা দেয়, তখন তাদের অঙ্গে পরিপুষ্ট ঢল-ঢল যৌবনশ্রী। তাদের সেই ঢল ঢল অঙ্গের লাবণীতে লজ্জা পেয়ে তাদের গৈরিক ততক্ষণ ম্লান হ'য়ে গেছে যেন। বাঙলার কদার, বাঙলার গোষ্ঠ, বাঙলার পল্লী, বাঙলার নগরী তখন তাদের

বরণের ডালা হাতে, উলু-শঙ্খধ্বনি করে, পুষ্পলাজবৃষ্টি করে বরণ করে নিয়ে যায় আপন আপন ছয়ারে, আপন ঘরে। বালাযোগী আজ ভিখ্ মাঙতে এসেছে তোমার ছয়ারে। ছয়ার খোল—বেরিয়ে এস—বালাজীকে কি ভিখ্ দেবে তুমি—তার বুলিতে দেখ তোমার—তোমার বাঙলার ঋদ্ধি সিদ্ধি সবই। তপোবনের পাষাণ থেকে বেরিয়ে এসেছে করুণাঘনমূর্তি বালানন্দ তার ঋদ্ধি-সিদ্ধির বুলি লুটিয়ে দিতে তোমাদের ছয়ারে ছয়ারে! তাই ব'লছিলাম—ঐ রুক্ষ পাষাণের কুক্ষিতে জন্মেছে এত বড় একটা দেশ, এমন বিচিত্র তার প্রাণ-সম্পদে—তার যত কিছু আলো, যত কিছু রস, যত কিছু ছন্দ নিয়ে! শুধু অভিমান ক'রেই কি বলবে তারে—শুধু অজ্ঞানেই কি ভাববে মনে—“মা আমার পাষাণী?”

বাইরের পাষাণ না হয় থাক এখন। ভেতরে দেখ না কিসে কি হচ্ছে। একটা যুগ হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পড়ে আছে পাষাণের মত জমাট আর আড়ষ্ট হ'য়ে। তার ফাটলে লুকিয়ে আছে হয়তো কার্লমাক্সের বীজ, বঙ্কিমের ‘বন্দেমাতরম্’। কিন্তু পাষাণ ঠেলে সেটা বেরুচ্ছে কই? প্রাণের স্পন্দনহীন এক অচলায়তনের কারায় সে রয়েছে শৃঙ্খলিত বন্দী; বিকাশ-উন্মেষহীন এক গতানুগতিকতার পাকে আমাতে অবিশ্রান্ত ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। এক একটা যুগ সত্যিই যেন এমনি ধারা প্রস্তর যুগের মত হয়ে প'ড়ে। তখন মানুষ যেন হয় গুহাবাসী। গুহা জিনিসটাকে তলিয়ে বড় করে নিলে, গুহাবাসী সে প্রায় সর্বাবস্থাতেই। গুহার একেবারে মর্মকেন্দ্রে যেয়ে “মেইন স্ট্রীং”টি দখল করা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ মানুষের—শুধু মানুষ কেন, সকল কিছুরই—কারবার এক রকম না এক রকম ধারা গুহার বন্দোবস্ত মাফিকই চলবে। গুহাগুলোও আবার যে ঠিক ক'কুঠরী তা বলা শক্ত। আগে

ছোটো কুঠরীর সন্ধান আমরা নিয়েছি—সেই কারবারের “স্টল” আর “গুদাম” মনে নেই? খানিকটে নিয়ে কারবার খাটাচ্ছি, পুঁজিটা রয়েছে মজুদী ভাঁড়ারে। অবশ্য আমদানী রপ্তানী হচ্ছে মাল। বাইরে থেকেও অনেক কিছু আসছে; আবার এখান থেকেও অনেক কিছু বেরুচ্ছে। তা হলেও ঐ ছ’কুঠুরী প্যাটার্নটাই বাহাল রয়েছে। যাক্—একটা যুগকে যখন বলছি প্রস্তর-যুগ, তখন তার গুহাগুলো হয় প্রায় যেন কয়েদীর ‘সেল’। গাঞ্জীর গাঁটগুলো তখন থাকে বেজায় জব্দ; মুখ খুলে সহসা বেরুতে দেয় না। যেটা মামুলি তা থেকে রেহাই মেলা ভার তখন।

গাঞ্জীর তিনটে দশা কল্পনা কর। শুধুই পাক খাওয়াচ্ছে। গ্রহ-উপগ্রহগণ যেমন ধারা পাক খায়; এ্যাটমের ভেতর তৈজসরেণু-গুলো যেমন ধারা পাক খায়। এটা হচ্ছে শুধু গতানুগতিকতার বন্দোবস্ত—‘পিওর রুটিন’ মানিয়ে চলা। যেগুলো ভাবি জড়, তাদের ভেতরে গাঞ্জীর, গুহার এই মূর্তিটাই সব চাইতে বেশি দেখি। কিন্তু সেখানেও এর ব্যতিক্রমের ধাঁজ দেওয়া আছে, লক্ষণও যে কুত্রাপি একটু আধটু ফুটে নেই এমন নয়। তারও পাষাণ-দেউলে ফাটল আছে, তারও কারাকক্ষে তলে তলে বেরুবার গোপন স্তূড়ঙ্গ আছে। না থাকলে জড়ের—ঐ পাষাণীর—শাপমুক্তির কোন সম্ভাবনাই যে রইত না! যে রয়েছে ও-গুহাতে বন্দী, “সে কে বটে হে”, তার পাক্তা এখনও বিজ্ঞানের পথে ঠিক লাগে নি, সত্যি। তবে যেটুকখানি পাক্তা মিলেছে, তাতেই মনে হচ্ছে—ভেতরে যেটি র’য়েছে সে সকল বাঁধনে বাঁধা দিয়েও কেন যেন দিচ্ছে না পুরো-পুরি ধরা। তাকে পরীক্ষার, গণিতের যত মিহিজালে ঘিরে আটকাতে চাচ্ছি সে ততই তার ফাঁকগুলো দিয়ে গ’লে যাচ্ছে। কত কৌশলে মাপের পাত্রে তাকে কত সাবধানে ঢালছি, সে প’ড়ছে

উপচে। একটা সমস্তার সমাধান দিয়ে তাকে ঘিরে নিশ্চিত হব ভাবছি, ওমা! তার ভেতরে নতুন সমস্তার ফাটল বের ক'রে সে গেল আমার বোঝাপড়ার আয়ত্তের বাইরে! ভেতরে হাল এমনি-ধারাই বটে। তবে, ওপরটা দেখতে গেলে—জড়ে মনে হয় পাক-খাওয়া গাঙ্গীগুলো বেশ জব্দ ক'রেই আটকানো।

তারপর, যেগুলোকে বলি প্রাণী, তাদের গুহাগুলো মনে হয় যেন অস্থি প্যাটার্নে তৈরি। রুটিন মত, ঘুরপাক খেয়ে চলা সেখানেও বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা “পূরক” (component, কম্পোনেন্ট) স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে একটুখানি নতুন হ'য়ে, স্বতন্ত্র হ'য়ে, ছাঁচ আর কাঠামোর যেটা গাঙ্গী, যেটা বাঁধন, তার বাইরে বেড়ে ওঠার তাগিদ। এই “কম্পোনেন্ট”টাই জড়গুলাতে প্রায় “নিল্” (nil) বা শূন্য হ'য়ে থাকে মনে হয়। ঠিক তা থাকে না, থাকবার জো-ও নেই। প্রাণের স্তরে এসে এটা হয় স্পষ্ট। জড়ে হৃদটা থাকে বাঁধিগৎ বা বাঁধাবোলের মত। ফিজিক্স (Physics) সেই সব বাঁধিগতের ফরমুলা সাজিয়ে সাজিয়ে পাষাণী সত্তার ছন্দের বিরাট চেহারাখানা প্রকট ক'রেছে। প্রাণে এসে হৃদ হারিয়ে বা গুলিয়ে যায় না; বরং ধাতে আসে, প্রকৃতিস্থ হয়। সেটা নানান অভিনব বিকাশ ও ব্যঞ্জনা-বৈচিত্র্যে নিজেকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর ক'রে তোলে। একটা রাগের নির্দিষ্ট স্বররূপ বা ‘সারিগম’ আছে বটে। তার ভেতর কত কত তান তুলে তার রূপটিকে, রসটিকে লীলায়িত ক'রে নেওয়া যায়, যায় না? এক রাগের যেটা মূলবাণী তাকে আশ্রয় ক'রে নতুন নতুন রাগিণী—শুদ্ধ ও মিশ্র—অভিব্যক্ত হ'তে পারে, পারে না? হৃদ চলছে একটা বাঁধা খাতে। চলতে চলতে সে কেবলই ভাবছে—এদিকে কেটে একটুখানি সাবলীল ভঙ্গিমায় ফুটে যাব, না, ওদিক কেটে বেরিয়ে যাব একটুখানি মুক্তির, স্থপ্তির, পুষ্টির

খাঁটি রসাস্বাদে? বাঁধা খাতে বাঁধা চলতে তার সুখ নেই, স্বস্তি নেই। নিজেকে নূতনতর পূর্ণতর করার ঝোঁক সে পায় প্রাণের পরতে পরতে পা ফেলার তালে তালে। জড়ের মূলুকে সবই খাসা বাঁধা খাতে পাক খাচ্ছে। যেন কিছু বালাই নেই, ঝামেলা নেই, অস্বস্তি নেই, ক্লান্তি বলেও কিছু নেই। কিন্তু এখানে সেটি হবার জো নেই। এখানে প্রতি পা ফেলাটি এ-ধাঁচে হবে, কি ও-ধাঁচে হবে—এই চিরন্তন সমস্তার অফুরন্ত সমাধান ক’রতে ক’রতে ঠিক মিলিয়ে যেতে হয়। মামুলি ছন্দের গতানুগতিক অনুবর্তনে এখানে কুলায় না। এখানে ছন্দের সন্ধিতে সন্ধিতে শিল্পীর পড়ে তলব; স্রষ্টাকে দিতে হয় তার অঙ্গুলীর কুহকস্পর্শ ছন্দের প্রতিটি অভিনব রূপায়ণে। জড়ে মনে হয়, যেন ছন্দ-বেচারি চলছে পায়ে বেড়ি প’রে তার বাঁধা পরিক্রমাটুকু (round, রাউণ্ড) সেরে আসতে। একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই যেন! হ’লেই কৈফিয়ৎ তলব। উইরেনাস্, নেপচুন গ্রহের বেলা যেমন কৈফিয়ৎ তলব হ’ল, মিলেও গেল। মারকারির পেরিহিলিয়নের কৈফিয়ৎটুকু দাখিল ক’রতে জড়বিজ্ঞানকে তার অনেকদিনকার অভিট করা পাকা খাতাগুলোও কাটকুট ক’রতে হ’ল। এ সব কথা সাঁটেই হ’ল। তবে, হ্যাঁ, অণুর অন্দরে, কোয়ান্টার আমলে এসে ছন্দ-গুলার পায়ে বেড়ি যেন একটু আলগা হ’য়ে যাচ্ছে। জব্দ ক’রে আবার “রিবের্ট” ক’রে দেবার চেষ্টারও কস্মর নেই। কেউ বা হা’ল ছেড়ে দিয়ে বলছেন—আর কাজ নেই বাপু, ওকে মুক্তি দাও। অনড় নিশ্চিততার ফাঁসটা খুলেই দাও না কেন! আমিও নিশ্চিত হই—তাকে বাঁধবার ব্যর্থপ্রয়াসের অফুরন্ত চোরাবালি থেকে উঠে প’ড়ে! হাইজেনবার্গের নাম শুনেছ তো?

আচ্ছা, ছন্দের মুক্তি হ’লে সে কি হবে প্রাণের ছন্দের মত?

প্রাণের যেটা ছন্দ, সেইটেই হচ্ছে ছন্দের সজীব, সমগ্র রূপ। জড়ে ছন্দ ব'লে এদিন যেটা জ্বরদস্তি ক'রছিল, সেটা হচ্ছে কাটা-ছাঁটা মরা ছন্দ—ছন্দের মহাভূত, ছন্দের অতিকায় কঙ্কাল! এই কঙ্কাল-গুলো নিয়েই বিশ্বের এনাটমি (anatomy) এ যাবৎ সাধা হচ্ছিল, আজও টেনেটুনে হচ্ছে। প্রাণে এসে ছন্দ তার “পরিক্রমা”রূপ কর্মটি যে ছেড়ে দেয়, তা নয়! এখানেও ‘রিদম’, ‘সাইকল’, ‘রোটেশন’ (rhythm, cycle, rotation)—এ নিয়মমাত্তিক ঘুরে ফিরে আসা অজস্র দেখতে পাই। এই শালবনে তার প্রতিটি সূক্ষ্ম জৈব কোষে, ঋতুতে ঋতুতে, কত কতবার প্রাণপাত্তের মৌন-পরিক্রমা হ'য়ে গেছে, আবারও যাবে। তার প্রতিটি পরিক্রমায় নতুন কিছু ফুটে বেরুবার ঝোঁকটি র'য়েছে। একটা আর একটার হুবহু নকলটি নয়। তা হবার জো নেই। ভেতর থেকে কিসে যেন তা হ'তে দেবে না। তাকে বৈচিত্র্যের দিকে ফুটিয়ে তুলবেই। এমন একটা রূপ তাতে ফুটে বেরুবে যা তার এতদিনকার অবস্থা-ব্যবস্থাগুলো ঠিক প্রস্তুত ক'রে গুছিয়ে হাজির করে দিচ্ছে না। সেটা রেজাল্ট্যান্ট (resultant) নয়, এমার্জেন্ট (emergent)। পণ্ডিতি বোল-চালগুলো আবারও!

প্রাণকে বিকাশ পেতে দেখছি অশেষ বিধায়, অনন্ত বৈচিত্র্যে। কতকগুলো স্তরে ছন্দটাকে দেখি প্রায় সেই কঙ্কালের চেহারায়। কঙ্কালই যেন সার; সামান্য একটুখানি সজীবতার শাঁস তাতে লেগেছে। অনেক প্রাণীকে তাই দেখি কতকগুলো ধরাবাঁধা সাইকেল বা পরিক্রমার ভেতরই প্রায় জীবন কাটিয়ে দিতে। ঠিক ধরাবাঁধা নয় সেগুলো, সত্যি। একেবারে ধরাবাঁধা হ'লে ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন ব'লে প্রাণের রাজ্যে ব্যাপারটা আদৌ ঘটতো না। ছন্দ প্রাণে এসে শুধু মুমুকু নয়, খানিকটা মুক্তও নিজেকে ক'রেছে।

তার আদর্শ, তার প্যাটার্নটি কি বলতো? জ্যোতিঃস্বরূপ, রসস্বরূপ
আত্মার যে স্বাচ্ছন্দ্য, সেইটেই হচ্ছে তার পুরা আকৃতি। তাই হ'তে
চলেছে। কিন্তু ধাপের পর ধাপ ভেঙে, মোড়ের পর মোড় ঘুরে
যত পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে, ততই সে হ'য়েছে শিল্পী, কবি, শ্রষ্টার
ছন্দের মত অপরূপ সামগ্রী। ততই বাঁধা-খাত, বাঁধা চালগুলো
কাটিয়ে উঠেছে। মানুষেও দেখি বারোআনা রকম বাঁধা চালেই
চ'লছে। চলুক ক্ষতি নেই, কিন্তু বাঁধা চালের ভেড়াকান্তটি হ'য়ে
চললে তো ঠিক ছন্দ সাধা হ'ল না।

যাক—জড়ে পাচ্ছি পাক খাওয়া; প্রাণে পাচ্ছি পাক খেতে
খেতে ক্রমাগত পাক থেকে মুক্ত হবার ঝাঁক। এর ফলে এখানে
একটা অফুরন্ত “স্পাইরেল” (spiral) এসে দেখা দিয়েছে।
স্পাইরেলগুলিতে চলতে গেলে পাক খেতে হয়, কিন্তু ক্রমাগত “স্তর”
বদলে বদলে উঠে যেতে হয়, কি নেমে যেতে হয়। স্পাইরেলটা
অফুরন্ত—আরুরক্ষু, মুমুকু। তার মানে যতই উঠে যাচ্ছে, পাকে
পাকে স্তরে স্তরে আপনাকে কিছু নতুন, কিছু বিচিত্র ক'রেও
“আনন্দ” করে যাচ্ছে। এ উর্ধ্বগতি, প্রগতি, অভ্যুদয়ের অবধি
কোথায়? নিচের মুখে যত নেমে যাও দেখবে,—স্পাইরেলের
‘রিংগুলা’ তত ছোট আর জমাট হ'য়ে এসেছে। বাধ্যবাধকতার
জুলুম ততই বেড়ে গেছে। জড়ের কোঠায় পৌঁছে দেখি—ছন্দ
হয়েছে বিরাট কঙ্কালসার কতকগুলো “এবষ্ট্রাক্ট ফরমুলা” (abstract
formula)। ছন্দের “আশ্রয়”টি হয়েছে “যন্ত্র”, ‘পিওর মেশিন’
(pure machine)। ঐ যে ধুলোরন্তি, ওকে কি ভাববে?
ভাববে ওটা হচ্ছে ঐ মহা-স্পাইরেলের নিচেকার একটা “রিং”—
যেমন খাটো, তেমনি জমাট, তেমন মজবুত? কিন্তু বিজ্ঞানই
দেখিয়ে দিচ্ছে—ঠিক জমাট ও তো নয়! ওর বিরাট বপুর প্রতি

লোমকূপে (এ্যাটমে) একটা ক'রে মহাশক্তিময় জগৎ ! সে জগতে ঠিক “যন্ত্রের” নক্সাটি আর যেন হালে পানি পাচ্ছে না ; ছন্দও সেখানে ঠিক গোবেচারিটি হ'য়ে “খোয়াড়ে” আটকা থাকতে চাইছে না। তবে কি ভাববো—ঐ ধুলোরত্তির ভেতরেও স্পাইরেলটা রয়েছে—বাইরে তাকে যেভাবে আরুণাক্স মুমুক্স ভাবে দেখছি, হয়তো বা লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ভাবেই র'য়েছে ? কিসের যেন মৈনাকভারে স্পাইরেলটা চেপটে জড়োসড়ো হ'য়ে এতটুকু হ'য়ে নেই তো ? কি যেন একটা বিপুল, বিরাট চাপ তাকে চেপে এতটুকু ক'রে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে ‘মুর্দা’, তার ছন্দকে করেছে কঙ্কাল কাঠামো ?

এদিকে আপনার অনুভূতিতে পৌঁছে জ্যোতির সঙ্গে রসের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়টাও যেমন ঘটছে দেখি, তেমনি দেখি ছন্দটাও একটা নতুন পরিচয় নিয়ে এসে হাজির হচ্ছে। জ্যোতি আর আসলে বাইরের কোন আলোটালো রইল না—হ'ল স্বপ্রকাশ চেতনা ; তাতে ক'রেই সব প্রকাশ পাচ্ছে, শ্রুতিও যেমন বলেন। রসও হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎস। আর, ছন্দ ? সেও হ'ল স্বাধীন স্বচ্ছ। অথচ সব কিছু ছন্দের মিল হবে, সন্ধি হবে তাতে।

জড়তে যে চক্র ঘুরছে তার ঠিক নাভি পর্যন্ত এখনও কেউ যায় নি। যেটাকে অণুর নিউক্লিয়াস (nucleus) বলছি, সেটাত নাভির চারধারে “নাড়ীচক্র”। নাড়ীগুলো দিচ্ছে বটে কিছু পরিচয় নাভির। একটা বিপুল তৈজসসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসের সন্ধান তারা দিচ্ছে। কিন্তু ওর যা নাভি, যেটা “ভুবনস্ত নাভিঃ,” সেটা আসলে কি তা ধরতে হ'লে নিজের অনুভূতি নিয়েই আরম্ভ ক'রতে হবে, তারই ভেতর “দম সামর্থ্যে” ডুব মারতে হবে। আপনার অনুভূতিতে যেটাকে জ্যোতি, রস, ছন্দ ব'লে পাচ্ছি, সেইটেই নাভি হ'য়েছে

আমাতে, ওতে, সবতাতে। তবে, এখানেও—আমার আপন
 অনুভূতিতেও—নাভির চারধারে নাড়ীর জট পাকিয়ে আছে বিস্তর।
 নাভিকে ঠিক স্বচ্ছন্দে, অবাধ ক্ষুণ্ণিতে দেখি কৈ? পরম কারণ
 যেটি, তার নাভিকমলে জন্মাল প্রজাপতি, সব কিছু সৃষ্টির জন্ম।
 পরম কারণটি হ'ল পদ্মনাভ। বেশ, কিন্তু প্রজাপতি নিরুদ্বেগে
 আপন কর্মটি সমাধা ক'রতে পারছেন কই? মধু আর কৈটভ হ'ল
 বৈরী। হ'ল কেন, এখনও হ'চ্ছে। মধু-কৈটভ মরেও মরেনি।
 তারা সবতা'র ভেতরে আড্ডা গেড়ে ব'সে আছে। সব রকম গুহাতেই
 তাদের কায়ম কেলা বানিয়েছে। কৈটভ হচ্ছে—যেটা জ্যোতির,
 রসের, ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ধারাটিকে বেঁকিয়ে মুচড়ে পাকিয়ে বেঁধে
 রাখে। ঝর্ণা ঐ ছুটেছে; একটা কুণ্ড, একটা গর্ত দেখিয়ে দিয়ে
 বলে—এর ভেতরেই ঢোক, ঢুকে পাক খাও। ঝর্ণা ঢুকে পড়ে
 গর্তে, খাসা পাকও খেতে থাকে; কিন্তু “স্বভাব না যায় মলে”—সে
 গরজী গর্তে সে সুস্থির হবে কেন? সে ক্রমাগত উপচে যেতে
 চাচ্ছে! মধুটা হচ্ছে কৈটভের “করিতকর্মা” দোসর। কৈটভ
 ইশারা করে, মধু তা হাসিল ক'রে দেয়। কৈটভের কর্মকর্তা মধু।
 আচ্ছা, ঝর্ণা না ব'লে পদ্ম বলবে? বিকাশ-উন্মেষের কেন্দ্র।
 পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে ফুটেই যাচ্ছে। ভেতরকার নাভি
 বীজাধার, আর বেরুচ্ছেই না। এখন দেখ, মধুকে কৈটভের চাকরি
 থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পদ্মনাভের চাকরিতে বহাল ক'রবে? মধুটিকে
 ওর চাকরি থেকে ছিনিয়ে আনতে গেলে, তোমাকে হ'তে হ'বে
 মধুসুদন; আর মধুকে আপন চাকরিতে বহাল ক'রলে, হবে তখন
 মাধব, যাত্রার মাধব। সোজা কথায়—একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-
 বিকাশের ধারা; তার দুই দশা। একটা হচ্ছে, ধারাটা বেঁকে
 একটা গণ্ডীতে, গুহাতে নিজেকে আটকালো। আর একটা, সেটা

গণ্ডী ছাপিয়ে উথলে গেল। বক্র একজন, ঋজু একজন। সঙ্কীর্ণ একজন, উদার একজন। অল্প আর ভূমা। বদ্ধ আর মুক্ত। মধু এ ছুঁয়ের কার তাঁবেদার হবে? যে শুধু বাতলায় না, কাজ করে, তার নাম রেখেছি ‘মধু’। তার একদণ্ড জিরেন নেই। কাজ হবে কার কথায়—বাঁকার কথায়, না, সোজার কথায়? যে বাঁধবে, আটকাবে তার হুকুমে, না, যে খুলে দেবে, ফুটিয়ে তুলবে তার হুকুমে?

‘নাভি’ ধূলাবালিগুলোতে লুকানো। কৈটভ মধুকে ঘাড় ধ’রে খাটিয়ে নিচ্ছে। বেশ জব্দ ক’রে আটকানো গুহা। প্রাণে এসে নাভি—জৈবকোষের নিউক্লিয়াসে, ধাঁজে—ফুঠে উঠছে। কৈটভ একটু একটু ক’রে হেরেও যাচ্ছে। মধু ছ’মনিবের হ’য়ে খাটছে। কারুর মন ঠিক জুগিয়ে উঠতে পারছে না। চক্র হ’ল ‘স্পাইরেল’। চক্রের নাভি হ’ল স্পাইরেলের “ধুর”, এক্সিস (axis)। নাভিই নিজেকে ধুর বানিয়েছে। নাভিকে স্বরূপে স্বচ্ছন্দে না জানা, না পাওয়া পর্যন্ত ধুরকেও জানা পাওয়া হবে না। এইজন্মই না যন্ত্র ক’রে খোদ আপনাকে জানতে হয়। ঐ একটায় নাভিজ্ঞান হ’লে সবতা’য় নাভিজ্ঞান, নাড়ীজ্ঞান। যোগীরা দেখি নাভিচক্রে ‘সংযম’ ক’রতে ব’লেছেন। কিন্তু নাভির নাভি যে বস্তুটি—আপন অল্পভূতিতে যার জ্যোতি, রস, ছন্দ সত্তার কিছুটা নিঃসংশয় আশ্বাদ পাচ্ছি—তাতে সংযম না হওয়া পর্যন্ত, ভুবনের নাভিজ্ঞানটি হবে না। তাই না স্পাইরেলে ঘুরতে ঘুরতে—কখনও উঠছি কখনও বা নামছি—চক্র লাগাতে হয়, কি ক’রে ঘুরতে ঘুরতে সাঁৎ ক’রে বেরিয়ে এসে ধুরে লেগে যাব! লাটিম বেশ খানিক স্থির হ’য়ে ঘোরে বোঁ বোঁ করে, তারপর বার কতক টাল খায়, শেষকালে সাঁৎ করে ছটকে বেরিয়ে যায় পাক কাটিয়ে। সেই চেষ্টা ক’রতে হয়—চলতি চাক্রিতে পেবাই হচ্ছে, ছটকে গিয়ে চাক্রির কীলটা ধরি কি করে?

‘কীল’ মানে সকল ছন্দের প্রভু, স্বামী যে ছন্দ, সেই ছন্দ। অথবা, জ্যোতি ক’রে, রস ক’রেই দেখ না কেন, যেমন খুশি। স্পাইরালে অনেক দূর উঠে স্পন্দনের, কিনা, ছন্দের একটা মোক্ষম সন্ধিতে (চরম ক্রিটিকাল্ ভ্যালুতে, critical valueতে) না পৌঁছান পর্যন্ত, পাক কেটে বেরোন যাবে না। আর সে ‘ক্রিটিকাল্ ভ্যালু’টা আদায় করা যায়, স্পাইরালের পথ চলতে ক্রমাগত আপন “মুখ” ঐ নাভি বা ধূরের দিকে রাখার ঝাঁকটা বজায় রেখে আর বাড়িয়ে গিয়ে। নাভি থেকে যে শক্তি উৎসারিত হচ্ছে, মুখ না বঁকিয়ে সোজা রেখে, সে শক্তি আপন এই চলতি আধারে আয়তনে ক্রমাগত জুগিয়ে জুগিয়ে।

এ চক্র-নদীটাতে জোয়ার-ভাঁটা খেলছে। মজাসে খেলছে—কখনও ওপরে ভাঁটা, তলে জোয়ার, কখনও তলে ভাঁটা, ওপরে জোয়ার; অর্থাৎ, হুমুখো শ্রোত এক সঙ্গে। এক মুখে ঐ ধূর বা নাভির দিকে টান ধ’রে। এ নাভিটান মরণের নয়, অমৃতের টান। আর এক মুখে—তা থেকে উন্টে ঠেলে নিয়ে যায়। ছুই-ই চলছে। তাক্ বুঝে পানসির মুখ ঘোরাতে-ফেরাতে হয়। তাক্টি ঠিক ঠিক বুঝে পানসি ছাড়তে যে জানে, সেই হচ্ছে মাঝি, কর্ণধার—গুরু শক্তি। গভীর সন্ধানী জোয়ারের তলে ভাঁটা, ভাঁটার তলে জোয়ারের “গোণ” বাতলে কিস্তি জমিয়ে দেয় আত্মারাম অভয়ের ঘাটে। একটানা ভাঁটা আর অফুরন্ত চোরাবালি দেখে কেউ ভড়কো না যেন, আমি যেমন ভড়কাছি। জোয়ারও যে লেগে আছে, কভু গর্জে ডাক দিয়ে, কভু বা আবডালে চুপিচুপি। চুপিচুপি যখন, তখন তো টেরই পাও না। ডেকে হেঁকে আসে যখন, তখনও জেগে ঘুমোনের ভাণ করবে? আর, একটানা ভাঁটাই ভাগ্যে রইল, উজোন আর হল না বলে কপালে করাঘাত করবে?

তিনটে ভূমি পাচ্ছি, নয়? পরিক্রমার ভূমি, প্রগতির ভূমি, প্রতিষ্ঠার ভূমি। ব্যক্তির জীবনে, সমাজ-সভ্যতার জীবনেও, ঐ তিনরকম ভূমি দেখতে পাবে। প্রতিষ্ঠা মানে পাষাণী-প্রতিষ্ঠা বুঝ না। ব্রাহ্মী স্থিতি, ভগবৎ-সাম্রাজ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। প্রগতিভূমির পরাকাষ্ঠা হচ্ছে প্রাজাপত্য পদবী, স্বারাজ্য-সিদ্ধি। আঁচে বুঝে নাও আপাতত। সাধুসন্তদের জীবনে এই তিনটে ভূমি বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে দেখি। আবশ্যকমত সময় সময় “গুহায়” ঢুকে আত্মসমাহিত হ’য়ে; আবার বেরিয়ে এসে মৈত্রী, করুণা, সর্বভূত-হিতে রত হ’য়ে; জগদ্ধিতায়, কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় সর্বকর্ম আচরণ সমর্পণ করে।

যাঁর এই তপোবন, সেই বালানন্দ ব্রহ্মচারিজীর জীবনে বাহ্যতঃ এবং বস্তুতঃ এই তিনটে ভূমি স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। বাহ্যতঃ—বার বছর ধ’রে তাঁর নর্মদা পরিক্রমা; তারপর বহু বৎসর ধ’রে উত্তরাখণ্ড, দাক্ষিণাত্য এবং ভারতের যত যত তীর্থ ভ্রমণ, সাধুসঙ্গ আর তপস্যা। শেষকালে, গতি ছেড়ে স্থিতি—এই তপোবনে প্রতিষ্ঠা। ভেতরের দিক দিয়ে—প্রথম ঋতচক্রের পরিক্রমণ, তার ফলে ঋতসিদ্ধি; তারপর, ঋত থেকে সত্যের শিব-সুন্দরের পাশে ক্রমে ফুটে ফুটে যাওয়া; সত্যের, শিব-সুন্দরের পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম রূপের ক্রমাগত অন্বেষণ আর তাতে অভিনিবেশ। আরও সত্য জ্যোতি, আরও শুদ্ধ রস, আরও সুন্দর ছন্দ—এই ভাবে সৃষ্টির নাভির দিকে আগুয়ান। শেষকালে, এমন এক ভেতরকার ভূমিতে এসে প্রতিষ্ঠা, যেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে না যেয়েও তার আপন সন্ধিতেই, “পুরা ভাণ্ডারের” পুরা ঋদ্ধি-সিদ্ধির সন্ধান মেলে। গুরুশক্তি দেখছি, অভিনিবেশটি তাঁর “নাভিমুখো” ক’রে দিয়েছেন, গোড়াকার ঐ ঋতচক্র-পরিক্রমার অবস্থা থেকেই।

। চার ।

গুহা দেখতে যাচ্ছি, টর্চ এনেছি তো? কেন এমনি শাদাচোখে মালুম হবে না? বাতির দরকার? গুহার বাইরে কে একজন ফ্যাণা দেখি যত রাজ্যের নানান রঙের লুড়ি কুড়িয়ে একটা কি বানাচ্ছে আর ভাঙছে আবার গড়ছে। ডেকে বলছে—গুহা দেখবে? এই দেখ না গুহার নক্সা বানিয়েছি, অবিকল নক্সা, টর্চের একটি পয়সা খরচ নেই, শাদাচোখেই দেখে নাও। তাজমহল দেখতে গেলে দেখা যায়, তার শাদাপাথরের নক্সা বিক্রি হচ্ছে পথের ধারে। সে নক্সায় খোদ তাজমহল নকল হ'য়েছে কতটা? তাজমহল না দেখেই তার নক্সাখানা নিয়ে ফিরে আসব পথ থেকেই? ঐ গুহার নক্সা-ওয়াল ফ্যাণাকে চিনেছ? ও হচ্ছে ঐ চলন-হাটের “কারবারি আমি”। সে শাদাচোখেই এই চলন-হাটের (ওয়ার্ল্ড অব কমন্ প্র্যাক্টিকাল কনভেনশনস্, world of common practical conventions) সকল পশরা আমায় দেখাচ্ছে। কিন্তু দেখছি কিভাবে কতটুকু? তাজমহল দেখতে যাব, সে পথ থেকেই আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছে হাতে একখানা সস্তা দামের ঠুনকো নক্সা গুঁজে দিয়ে! আমিও ফিরছি তাই হাতে পেয়ে! সত্যিকার তাজমহল—বাকে দেখে মনে হবে, পরিপূর্ণ ছন্দ-সুঘমার গাঢ় স্বপ্ন রূপায়িত, লীলায়িত, অমলধবল মর্মরে—তার কোন মহলেই ঢুকলাম না, তার পানে মরমী দৃষ্টিতে একটিবার চাইলামও না! নকল হাতে পেয়েই এত মশগুল।

কারবারি “আমি” হচ্ছে বাদসাদ দিয়ে নিজের গরজে আপন ফরমাস মাফিক লেনেওয়াল এক ব্যক্তি। যে পুরা সাক্ষাৎ

অনুভূতিটা আমার হচ্ছে, একটু খেয়াল করলেই ধরতে পারি সেটা এমন একটা জিনিস যে তাকে একটা চৌহদ্দির ভেতর ঘিরে বলা যায় না, বাস, এটা এই পর্যন্ত ! অথচ, জিনিসটাকে ছোট-বড় নানান রকমের চৌহদ্দির ভেতর না পুরলে তাকে নিয়ে কারবারে খাটাতে পারিনে। শ্রাবণের ধারা সব তলিয়ে দিয়ে গেল ; কিন্তু মুলুকের জল নিয়ে আমি কি করবো ? আমার ডোবা পুষ্করিণীতে যতটা তার ধরে আটকে রাখতে পারি ! মাটির তলায় জলের স্রোত রয়েছে তো সব জায়গাতেই, কিন্তু একটা ছোট কুঁয়ো কেটে আমার প্রয়োজনের জলটুকু জমিয়ে নিলেই আমার হ'ল। গোটাতে, পুরাতে দরকার নেই। একেবারে গোটা, পুরা নিয়ে কারবার হয় না। অপ্রমেয় অথও হ'লেই অব্যবহার্য, কাজেই টুকরার, ডোবার কারবার চলছে। যেটা আসছে, পাচ্ছি বা রয়েছে তার অনেকটা বাদসাদ দিয়ে একটুখানি নিয়ে তাকে ব্যবহারে লাগাতে হয়। পুরাকে দেখার চোখটি হবে বুজতে। তাকে দেখেও দেখব' না ; দেখেও দেখছি ব'লে মানব' না। একেবারে না দেখে উপায় নেই। অনুভূতি বা এক্সপিরিয়েন্স (experience) আসলে গোটাই জিনিস। কাজেই তার খানিকটে ঢেকে আড়াল করার ফন্দি দেখতে হয়। যেটা সত্যিই পাচ্ছি ব'লে স্বীকার ক'রতে যেন নারাজ হচ্ছি। এই জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছি তো অনেক কিছুই, তা'ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে শুনছি, স্পর্শ করছি, ভ্রাণ পাচ্ছি, মনে মনে ভাবছিও মেলা কিছু। এই সবগুলো নিয়ে এছাড়া আরও অনেক কিছু—যা ঠিক সনাক্ত করতে পারছি—জড়িয়ে আমার “এখানকার” সমগ্র অনুভূতি। কিন্তু এতটায় আমার গরজ নেই। তাই ভাবি—ঐ পশ্চিমে হাওয়ায় পত্পত্ গৈরিক পতাকাটাই দেখছি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাই বলি। কারবারী ভাবনা-চিন্তা, বলা-কওয়া করতে

গেলে এই রকম ক'রেই করতে হয়। ষোলআনা পাওনাটা অস্বীকার ক'রতে হয়। এমনি সাচ্চা কারবার ফেঁদেছি! যে শাদা-চোখের বড়াই করি, সে চোখ হচ্ছে এমনিধারা সাচ্চা! তার স্বভাবটাই 'একচোখো'। পক্ষপাত না করে সকলে সমান ব্যবহারটি তার দ্বারা হবে না। ক্রতু বা যজ্ঞের জন্তে সৃষ্টি, এই বিশ্ব-কারবার—বেদ বলেন। যজ্ঞ মানে, 'বলি' দিতে হবে কিছু। বলি দিয়ে "যজ্ঞশেষ" যেটুকু সেইটুকু আহার করতে হয়। যজ্ঞ অনেক রকম, গীতায় দেখতে পাবে। 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' পর্যন্তও। আসলে আমাদের জীবনের অনুভূতি, এক্সপিরিয়েন্সটাই যজ্ঞ। বলি বা ত্যাগ আছে তাতে। পুরো বা গোটা বস্তুটা পেয়েও নেবার জো নেই। তাকে নিয়ে সামাল দিতে পারি কই? সাগরে নেমেও ঘটি ডুবিয়ে সাগরের জল তুলে কাজটি আমার সমাধা ক'রতে হবে। নিজেই ডুবলে, তলিয়ে যাবার কি একেবারে গলেও যাবার ভয়। গঙ্গাজলেই গঙ্গা-পূজো। তবু হাতের আঁজলায় কিংবা কোশায় ভ'রে ভরা গাঙ্গে জল নিচ্ছি, আবার সেই ভরা গাঙেই ঢালছি! এই রকম যেটা গোটা, তা থেকে একটুখানি ভাব যেন সরিয়ে নিয়ে সেইটে আবার গোটাতে মিলিয়ে দেওয়া বা মেলাবার যত্ন করার নাম ক্রতু বা যজ্ঞ। গোটা থেকে একটা টুকরো বেরিয়ে আসবে। তাদের ভেতর 'তফাৎ' বা ব্যবধানের মতো একটা কিছু জন্মাবে। তাতে করে একটা 'ক্লোভ' বা 'স্ট্রেস'র (stress) সৃষ্টি হবে। যেন গোটা তার টুকরো ছেড়ে স্থিতির নেই, টুকরোও গোটা ছেড়ে স্থিতির নেই! এই ক্লোভটা কারবারে সর্বত্র দেখাতে হবে। আস্ত সামলাতে না পেরে টুকরো নিয়ে, ভাগা নিয়ে এলাম। নিজের গরজ, ফরমাস মত। কিন্তু ভাগা হাতে পেয়েই ক্লোভ হ'ল—ভারি ঠকিয়েছে তো! একরত্তি "মাল" সওদা করে এলাম। এত অল্প, 'নাগ্নে সুখমস্তি'।

কিসে বড় হব, বড় আরও বড়—এই ফিকির চলতে থাকে। সেই গোটার আবার মেলাবার ব্যাকুলি! অথচ, গোটা ছেড়ে একদণ্ডও নেই! সেই ভরাগাঙ্গেই আঁজলা ভ'রে তর্পণ ক'রছি। আঁজলার মুখটা উল্টোলে—এ গঙ্গামুখো হ'লে—তাতে আর জল ওঠে কই! গঙ্গা থেকে জল আঁজলায় কি ঘটতে ভ'রে উঠাতে গেলে তা থেকে এক রকমের বৈমুখ্য পাওয়া দরকার হয়। আবার মেলাবার সময়, এই বৈমুখ্য উলটে “আভিমুখ্য” দরকার হ'য়ে পড়ে। ব্যাসঙ্গের জায়গায় দরকার হয় তাতে আসঙ্গ। পণ্ডিতি বোলচাল।

গুহা দেখতে যেয়ে প্রথমেই যে স্ক্যাপাটার সঙ্গে সাক্ষাৎ সে হচ্ছে এই “কারবারী আমি”। সে গুহার একটা নকল নক্সা বানিয়ে তাই হাতে দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দেয়। যেটা আসল, যেটা খাঁটি, যেটা গোটা, যেটা পুরা, তা থেকে আমায় বিমুখ করে আনে। এ স্ক্যাপাটির আবার দুই ভোল। একটা “ব্যাপারী” আর একটা “কারবারী”। একজন বাইরে বসে নকল আর টুকরোর স্টল সাজিয়ে রেখেছে। এ হ'ল ব্যাপারী। আর একজন—ওরই দোসর—আড়ালে থেকে সব কিছুর নকল আর টুকরো-টাকরার মাল তৈরি করে' বাইরের স্টলে সরবরাহ ক'রে দিচ্ছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—একদণ্ড ফুরসুৎ নেই। এই নেপথ্যের ‘আমি’টাকে ‘চিন্ত’ ব'লবে, না কি বলবে, মনের মজুদী-শক্তির ভাঁড়ার? তাকে না হয় বল কারবারী। কারবার তারই; স্টলের ব্যাপারী বেচারি খামকা নিমিত্তের ভাগি হ'লে কি হয়? তবে, এই যে ভোলটা দেখাই—ব্যাপারী আমি—সেটা কি একান্তই একটা নাচের পুতুল? ভেতরে কেউ বোতাম টিপে সূতো টেনে পুতুলটাকে দরকার মত নাচিয়ে নিচ্ছে?

ব্যাপারী আমিটার পেছনে তাকে চালাবার একটা নেপথ্য

বন্দোবস্ত আছে মনে হয়। কিন্তু তাই ব'লে ব্যাপারী আমিটা একটা পুতুল নয়, আর তাকে চালাবার ঐ নেপথ্য-বন্দোবস্তটাও একটা “কলকজ্জা” নয়। আমার একটা বাঁধনের দিক, বাধ্যতার বশ্ণুতার দিক আছে মনে হয়। জড়ে, নিম্ন থাকের প্রাণীগুলোতে, সে-দিকটাই বেশি ক'রে দেখি। কিন্তু কোথাও সেই দিকটাই সবটা নয়, এমন কি, আসলটা নয়। একটু ধুলোর ভেতরেও যে সত্তা র'য়েছে, তাকে বোল আনায়, স্বরূপে বাঁধে কে? শত সহস্র সৰু মোটা বাঁধনে ধরা দিয়েও সে ক্রমাগত বাঁধন এড়িয়ে যাচ্ছে। তার যন্ত্ররূপ, তার বাধ্যবাধক দশা সকল জটিলতা সূক্ষ্মতার ঠাশবুননের ভেতরে ক্রমাগত ফাঁক বের ক'রে তার নিত্যমুক্ত লীলা-স্বরূপকে কিছু না কিছু স্বচ্ছন্দ অবকাশ দেবেই দেবে। ‘অত্যতিষ্ঠদৃশাদ্বলম্’—রুটিন, মেশিন, মেকানিজমের (routine, machine, mechanism) কাঠামো যত না বড় ক'রে যাও, সে তাকে কিছু না কিছু অতিক্রম ক'রে যাবেই! সাগর ডিপ্তোতে গিয়ে হনুমানবাবাজী এক রাক্ষুসীর পাল্লায় প'ড়েছিলেন না? রাক্ষুসী হনুমানকে গেলবার জন্তে মুখের হাঁ-টি যত বড় করে, হনুমানও তাঁর কলেবর তত বড় করেন। হনুমানকে গিলেও আর গেলা হ'ল না। সব কিছুই এই ভাবে বশ্ণুতা বাধ্যতার রাক্ষুসে গ্রাস থেকে গ'লে বেরিয়ে যাচ্ছে! একটা এ্যাটমেরও পুরো মেকানিজম মিলেও মিলছে না। বাঁধনে আর মুক্তিতে রেস্ (race) চলছে। চলতেই থাকবে। চলতেই বাধ্য। তবু আমাদের, এমন কি, বিজ্ঞানেরও ব্যবহারে যেগুলো জড়, তাদের পায়ের শেকল বেড়িগুলোই যেন বেশি চোখে পড়ে। তাদের ভেতরে রস—আনন্দের মাত্রা—যাতে ক'রে তাদের গতিস্থিতির ছন্দগুলো খাত বা নিয়মের ধারা হ'য়েও আসলে লীলাছন্দ—কোথায় নির্খোজ হ'য়ে লুকিয়ে আছে যেন! বিজ্ঞান

তার পাক্সা লাগাতে পারল কই? তাদের ভেতরে জ্যোতি?—
তাকে পাচ্ছি রেডিয়েশন্ কোয়ান্টারূপে (radiation quanta) ।
তার কুলের খবর রাখি না। শীলের খবর রাখি আঁকের খাতায়।
তারপর, তাদের ছন্দ? পরিক্রমা, বীচিহিন্মোল—এই রকম সব
ছন্দ পাচ্ছি—স্থূলে স্থূল্লে একটা ইলেকট্রনকেও বীচিযুথ—ওয়েভ
প্যাকেট—(wave-packet) ক’রে দেখারও দস্তুর হ’য়েছে বটে।
কিন্তু ছন্দের মূলে রস, পেছনে শিল্পী গোপন র’য়ে আছে যে : বন্দীর
শৃঙ্খলিত পায়ে পরিক্রমার বাঁধনক্লিষ্ট আওয়াজগুলো কানে আসছে ;
কিন্তু কই নিপুণ নৃত্যশিল্পীর মরমী কলা-রসিকের স্বচ্ছন্দলীলারসসম্পূর্ত
চরণ-মঞ্জরী-শিঞ্জনটি শোনা যাচ্ছে কই? শোনার কানটি এখনও
ঠিক পাইনি। দেখা, শোনা, কথা, ভাবনা, চিন্তা—এ সবার ভেতরে
কিসের “তনু: প্রতিষ্ঠিতা?” মৃতের তনু—শব? না, অমৃতের তনু
—শিব? মৃতের তনু যদি থাকে ত’ কি হবে? যা কিছু দেখবো
শুনবো বলবো কইবো ভাববো, সবই হবে মরা-কাঠামোর করাতীকলে
ছাঁটাই। সবই হ’য়ে য’বে মরা কাঠামোর আড়ষ্ট ছাঁচে ঢালাই।
ডেড এবসট্র্যাকশন্গুলো (dead abstractions) পাব, ‘লিভিং
কনক্রিটগুলো (living concrete) এড়িয়ে যাবে। আমাদের
সাধারণ কারবারে তাই যাচ্ছে, বিজ্ঞানেও তাই যাচ্ছে। এ্যাটম
মলিকিউল্ থেকে শুরু ক’রে ধুলো পাথর সবই পাচ্ছি মরা-কাঠামো
রূপে। এমন কি, প্রাণকে মনকেও মেকানিজমের কাঠামোতে
পুঁরে ফেলবার জন্তে ক্রমাগত জবরদস্তি ক’রে যাচ্ছি। কাঠামোতে
দুকেছেও সব কিছু। প্রাণের মনের যন্ত্ররূপটি না মিলছে এমন না।
কিন্তু যন্ত্ররূপটি হাতে তুলে দিয়ে তার স্বরূপটি—তাদের সমগ্র সজীব
সত্তাশক্তি—ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কে একজন যেন তাজমহলের একটা
নকল ঠুনকো নক্সা হাতে গুঁজে দিয়ে পথ থেকেই বিদেয় ক’রে দিতে

চায় আমাদের। এই জন্মে বিজ্ঞানকে বলি প্রার্থনা করতে—“যা
তে বাচি তনুঃ প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি। যা প্রাণে মনসি
চ সম্ভূতা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥” আমাদের দেখা শোনা এ-
সবের মাঝে তোমার যে “তনু” অনুস্থ্যত র’য়েছে, সে তনু শিব হোক,
অমৃত হোক, সে তনু যেন এড়িয়ে চলে না যায়! শব-তনু আর
শিব-তনু। আমাদের সবাইকার হ’য়েছে মুদ্দাফরাসের কারবার—
মুরদা নিয়ে কারবার। মুদ্দা মানে কাটা-ছাঁটা টুকরো-টাকরা
এবস্ট্রাকশন, সেকশন, সেগমেন্ট (abstraction, section,
segment) ইত্যাদি। গোটা সজীব “ফ্যাক্ট” এ মুরদার কারবারে
অচল।

এইজন্মে কি ধুলো পাথর, কি প্রাণী কারুর সম্বন্ধেই গোটা
সজীব ফ্যাক্ট আদায় ক’রে নেবার জন্মে আমরা প্রস্তুত হ’য়ে নেই।
আমরা তার আদায়ের জন্মে প্রস্তুত না থাকলেও সে কিন্তু নিজেকে
নিঃশেষে দিতে কসুর ক’রছে না। তার দান সরাসরি বোলআনা
প্রতিগ্রহ ক’রতে পারছি না ব’লে ভেবো না যেন—সে আপনাকে
টিপে-টুপে দিচ্ছে। তাতে কার্পণ্য নেই। সে আসে সাগর হয়েই,
আমি তাকে মাপা ঘটি ভরে তুলে নিলে কি হবে? গোটার ভাগা—
ফ্যাক্ট-এর সেকশন (fact-section) নিয়ে কারবার ক’রতে হচ্ছে ব’লে
ভাবি না যেন, ফ্যাক্ট (fact) আমাদের সাক্ষাৎ নাগালের বাইরে।
যাকে আমল দিচ্ছি না সেই হবে আসল। যাকে হিসেবে ধরছি না,
সেই হচ্ছে সত্যিকার পূঁজি। আমলে না আনলেই, হিসেবে না
ধরলেই কি সে যাবে নাকচ হয়ে? সাক্ষাৎ অনুভূতি এক জিনিস,
আর সেই সাক্ষাৎ অনুভূতিকে “আমলে” আনা, তাকে স্বীকার
করা, তার হিসেব রাখা আর এক জিনিস। সাক্ষাৎ অনুভূতি—সমগ্র
সজীব ভাবে—মাপার বস্তু নয়। তার মেজার (measure) নেই, মাপ

নেই বলে তাকে নিয়ে কারবারও নেই। বুদ্ধি বল, অন্তঃকরণ বল, চোখ কান ইত্যাদি বল—সবই হচ্ছে, অমেয় অব্যবহার্য যেটি, তাকে কোন গতিকে ব্যবহারপোযোগী ক’রে নেবার যন্ত্র। যেটি আসলে আন্ডিফাইণ্ড, এলজিক্যাল, (undefined, alogical) সেটিকে ডিফাইন্ (define) ক’রে লজিক্যাল (logical) বানিয়ে নেবার বন্দোবস্ত। এতে ক’রে সাক্ষাৎ সমগ্র অনুভূতি—ফ্যাক্ট (fact)—নাকচ হ’য়ে যায় না। সেটি হ’বার জো নেই; তবে তাতে ক’রে সেটি হরেক রকমে ছাঁচে ঢালাই হ’য়ে কলে কাটাছাঁটা হ’য়ে আমাদের বিচার-বিবেচনা, বলা-কহার যোগ্য হয়, কাজে লাগবার লায়েক হয়। এমন কি সাক্ষাৎ সমগ্র অনুভূতি সম্পর্কে আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞান, চেতনা, সংবিৎও “আংশিক” হ’য়ে দাঁড়ায়। সমগ্র অনুভূতির সমগ্রতা অভিনিবেশ, অবচেতনার মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে পড়ে। বর্ণগ্রাম বা কলার-ব্যাণ্ডের (colour-band) দুই মুড়োর ‘পর’ আর ‘অবর’—আল্ট্রা আর ইন্ফ্রা (ultra and infra) “অতিদেশ” যেমন থাকে, তেমনি কারবারী জ্ঞানের দুই মুড়োয় দুটো “অতিদেশ” থাকে মনে হয়। সেই অতিদেশের এলাকায় বা কিছু থাকে, তাকে জ্ঞানের বাইরে সরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত আছি।

সেই সমগ্র, সজীব অনুভূতি—ফ্যাক্টকে “আমি” বলবো, না “তুমি” বলবো, না “সে” বলবো—তা জানিনে। তাকে “এখন-তখন”, “এখানে সেখানে” ক’রে ভাববো? সকল ‘কেন্দ্র’, সকল সম্বন্ধ, নিখিল নাম-রূপ তাতেই ফুটে র’য়েছে। অথচ, সে এসব আপন কুক্ষিতে ধ’রেও র’য়েছে এ সবার অতীত। এ সবার কোনটা দিয়ে অথবা এ সবার সবগুলো জড়িয়েও তার মাপ হচ্ছে না, তার ইয়ত্তা মিলছে না। জড়, প্রাণী, চেতনা, অচেতন—এ সব রকমারি কেন্দ্র, আর তাদের অশেষ-বিশেষ সম্পর্ক, ঐ ফ্যাক্ট-এরই এক্সপিরিয়েন্স-হোল

(Experience-whole), স্বগত বৈচিত্র্য। ফ্যাক্ট আমার বা তোমার বা তার নয়; ফ্যাক্ট-এরই আমি, তুমি, সে। তারই চিৎ-অচিৎ, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত। বেশ খেয়াল ক'রে কথাটা যাচাই ক'রে নিও।

একটা ধুলোও ওতে, আমিও ওতে। কাজেই ফ্যাক্ট-এর যেটা “মূল বস্তু” তা ওতে আমাতে সমান। ও হচ্ছে এক কিসিমের কেন্দ্র তাতেই আমি আরএক রকমের। আমার ব্যাপারী কারবারী ইত্যাদি ভোলও তাতেই। কেন্দ্র, ভোল—এ সব মানে? গোটা ফ্যাক্টকে রকমারি ক'রে মেপে নেবার, ভাগ-বন্টন ক'রে নেবার, সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবার, নানান ভাবে কারবারে খাটিয়ে নেবার এক একটা বন্দোবস্ত। কেন এ বন্দোবস্ত, কোথেকে এ বন্দোবস্ত—এর কৈফিয়ৎ দিচ্ছে কে? যাই হোক, সকল কেন্দ্র, সব ভোলেই সেই অখণ্ড মূলসামগ্রীর আসল বস্তুটা বহাল রয়ে গেছে। এক কেন্দ্র আর এক কেন্দ্রে—যেমন ধুলোতে—সে আসলকে আমলে না আনলেও সে আসল বাতিল হয়ে যায়নি। তাই প্রতিটি কেন্দ্রই হচ্ছে আসলে অখণ্ড, জ্যোতি রস ছন্দেই উৎস। আমি বা তুমি সাধারণ কারবারী গরজে অথবা ‘বৈজ্ঞানিক’ হিসেবে তাকে বা তার মধ্যে ‘শব-তনু’—মৃত কাঠামো—দেখলে কি হবে? আমাতে, তোমাতে, ওতে এই যে অখণ্ড জ্যোতি রস ছন্দ সত্তা—এটা শুধু কল্পনা ক'রে নেবার নয়; তর্কবিচার ক'রে সেধে নেবার নয়। এটা হচ্ছে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি। কল্পনা-টল্পনা, অনুমান-ফলুমান ওকে স্বরাপে, সাকল্যে প্রকাশ করে না, ওকে কতকটা নেপথ্যে রাখার জন্তেই ফিকির করে। কিন্তু তাতে ক'রে ‘নলচের আড়াল’ দেওয়া বৈ তো নয়! কোন এক কেন্দ্র (যেমন এই কারবারী ব্যাপারী—আমি) ফ্যাক্ট-এর অপর সকল কেন্দ্রের সঙ্গে এক রকমের বিরাট সম্বন্ধ-জাল বুনে রয়েছে। তাতে ক'রে তার সঙ্গে

আর একটার (যেমন ঐ ধুলোটার) এক বিশিষ্ট রকমের “সম্বন্ধী” অনুপাত (ratio), আর তার ফলে, এক রকমের ব্যাবহারিক অনুপাত বহাল হ’য়েছে। অনুপাতটা অনড় নয়; বদলায়, বদলাচ্ছে। ঐ ধুলোটার সম্বন্ধে আমার এই ‘শাদা চোখের’ অনুপাত, বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রপাতি, হিসেব ও থিওরির অনুপাত, যোগীর দিব্যদৃষ্টির অনুপাত আলাদা আলাদা। যে সব প্রাণীর ইন্দ্রিয়াদির গঠন, অনুভবের যন্ত্রতন্ত্র অন্তরকমের, তাদের অনুপাতও আলাদা। কাজেই, তাদের অনুভবে ও ব্যবহারে ঐ ধুলোটা ‘আমার’ ধুলো নয়। নানান কেন্দ্রে নানান রকমে ঐ ধুলোটাকে পাওয়া যাচ্ছে তাহ’লে। ওর সঙ্গে যার যেমন সম্বন্ধী ও কারবারী অনুপাত। অনুপাত বদলায়ও; ও হবে, দেখবে আর কিছু। তা হ’লে একটা কার্টাছাঁটা জিনিস নয়, দস্তুরমত ধুলোর একটা ‘সিরিজ’ পাচ্ছি। কাজেই, প্রশ্ন ওঠে—এই সিরিজের অবধি বা ‘লিমিট’ (limit) কোথা? পুরো ক্যাক্টরূপে ধুলোটা তা হ’লে কি?

ধুলো বলে বলছি। সব তার সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন। সাধারণ কারবারে জগৎটাকে এক ভাবে পাচ্ছি। সে ভাব যে না বদলাচ্ছে এমন না; তবু মোটামুটি এক রকমের বহাল রয়ে যাচ্ছে। তোমার জগতের সঙ্গে তার মোটামুটি মিলও দেখি—বিশেষ, তুমি-আমি যেটাকে “বাহির” বলি, সেইটে সম্পর্কে। তোমার-আমার যেটা “ভেতর” তাতে মিল তেমন নেই। মেলাবার চেষ্টা করি। একটা বিশেষ রকমের সভ্যতা, কৃষ্টি, ভাষা, ধর্ম, সমাজ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা—এ সবার ভেতর দিয়ে অনেকগুলো ব্যাপ্তি কেন্দ্র মেলাবার চেষ্টা করে—সমষ্টি, গোষ্ঠী, সম্ব, সম্প্রদায়, জাতি এই সব হয়ে। এক একটা ভাব, আদর্শ, মন্ত্র, নীতি, পদ্ধতি এই সব আশ্রয় ক’রে খণ্ডগুলো, টুকরোগুলো অথও সমগ্রে সম্মিলিত হ’তে চলে।

এ যাত্রা শুধু যে সমগ্রতার দিকে তা নয় ; সম্পূর্ণতা স্বচ্ছন্দতা ও চরিতার্থতার দিকেও বটে । সভ্যতা, কৃষ্টি, সমাজ, রাষ্ট্র—সবইতো পাচ্ছি সিরিজ (Series) ভাবে—ক্রমোন্নত অথবা ক্রমনিম্নভাবে । সিরিজের যেখানে অবধি, পরাকাষ্ঠা পরিপূর্ণতা সেখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার থামবার যো নেই । ততক্ষণ চলতেই হবে । চলার পথে সকলের সঙ্গে আমার সাধারণ কারবারী অনুপাতটা বদলে বদলে যেতে হবে । মমত্বের সঙ্কীর্ণ গর্ত বা গুহায় ব'সে জগৎটাকে ভাবছি আপন “খাত্ত-খাদক” । পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, জাতি, বিশ্বনর, বিশ্বপ্রাণী, সর্বভূত—এভাবে “আমি”টাকে বড় আর খাঁটি ক'রে ক'রে যেতে হবে । শেষকালে, ঐ ধুলো-বালিটাকেও পেতে হবে পুরা আত্মরূপেই । কারবারী অনুপাতগুলো শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিতে থাকবে জ্যোতি রস ছন্দের অথও পরিপূর্ণতার দিকে । বিজ্ঞানের হাত ধ'রে বেশ খানিক দূর পথে এগোন যাবে । কিন্তু আদি, মধ্যে, অন্তে তপোবন-বাগীও চাই । আত্মকুপা, তারপর গুরুকুপা, তারপর ভগবৎকুপা—বালানন্দজী বলতেন । আত্মকুপার মূল কথাটি হচ্ছে—‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’ । ‘উত্তীর্ণত জাগ্রত’ । ‘উদ্ধ-রেদাঅনান্নানং নান্নানমবসাদয়েৎ । আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ’ ॥

। পাচ ।

অনুভূতির কথা আগের বারে হ'য়েছে । এবার বিজ্ঞানের চোখে চোখ মিলিয়ে দেখি এস । বিজ্ঞানের দেখা সাধারণ চলতি দেখা নয় । বিজ্ঞানের দেখাতে এই পাথরটাও—কোন কিছুই—আর “নিরেট”, “অনড়”, “অসাড়” রইবে না । ঠিক একটাও রইবে না ।

ভেতরে ঢুকলে দেখব দরাজ ফাঁকা জায়গায় মলিকিউল্দের (molecules) ছুটাছুটি ধাক্কাধাক্কি; এ্যাটম্দের ঘর পাতানো, ঘর ভাঙ্গানো; এ্যাটমের ভেতরে তৈজস বালখিল্য মিথুনদের মহাফুঁতির নাচন-কৌদন; আর এইসবের নানান “তরঙ্গ” অনবরত বাইরে ছুটে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কতকগুলো এই এখানে আমার চোখের রেটিনাতে আছাড় খেয়ে, আমার ঐ অভিশপ্তা পাষাণীর কালো রূপটি দেখাচ্ছে; বাকিগুলো বিশ্বভুবনে বেপরওয়া ধাওয়া ক’রে যাচ্ছে। সব কিছুরে আছাড় খেয়ে প’ড়ে, সব কিছুর ভেতর থেকে নিগূঢ় চঞ্চল সাড়াটি জাগিয়ে নিয়ে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি গুহাটির দুয়ারে তার—ঐ অভিশপ্তা পাষাণীর অহর্নিশ আকুল ধরণা দেওয়া, তার চিরন্তন অতৃপ্ত আত্মনিবেদন! ঐ যে আমি অভিসারিকা—তোমার দুয়ারে সঙ্কেত করাঘাত করছি—তুমি ওঠ গো ওঠ—চকিতে দুয়ারটি খোল গো খোল, নাও আমায় নাও—তোমার নিবিড় মধু-মিলনের মাঝে নাও। বাড়াবাড়ি ভেবো না, সত্যিই ব্যাপারটি প্রায় এতদূরই গড়াচ্ছে। ইথারই (Ether) বল, আর অজানা মহা সত্তা-শক্তিই বল, আর যাই কেন না বল—নামে আসে যায় কি? ঐ পাথরের প্রতিটি রেণু এক অসীম অনন্ত সাগরে “হাত পা” ছুঁড়ে সাঁতার কাটছে যে। অসংখ্য পাথারে জুটি মেলাবার ব্যাকুলি, স্রাজ্জাতের সাড়া পাবার জন্তে অবিশ্রান্ত দাপাদাপি! দিকে দিকে ঢেউএর পর ঢেউএর সার ছড়িয়ে পড়ছে। এ সাগরে আর যারা “সাঁতারুর” দল, তাদের গায়ে সে ঢেউ কি গিয়ে লাগবে না? তাতে তাদের একটুখানি চেতিয়ে উদ্গ্রীব ক’রে তুলবে না?

আজ এই দণ্ডে এই ধুলোরত্তি যদি বিশ্ব থেকে একেবারে লোপাট হ’য়ে যায়, তা হ’লে ভাববে বুঝি, একটা নগণ্য বুদ্ধ

বেমালুম শূন্যে মিলিয়ে গেল ! তাতে ক'রেই বা কি ব'য়ে গেল ! ধুলোটা হচ্ছে অগণিত অণু বা এ্যাটমের সমষ্টি । একটি এ্যাটমের ভেতরে যে কি বিপুল শক্তি “ভাণ্ডারজাত” হয়ে আছে, তার হিসেব লাল খাতাগুলোতে কিছু কিছু পাচ্ছি । ঐ একটা এ্যাটমই যদি কোন কারণে তার সত্তাশক্তির গুহা বা ব্যুহটি একেবারে চুরমার ক'রে বেরিয়ে আসে শূন্যে তার সর্বস্ব নিঃশেষে লুটিয়ে দিতে, তা হ'লেই দেখি, বিশ্বভুবনে এক মহা সাড়া প'ড়ে যায় ! বিজ্ঞানে যেগুলোকে “কস্মিক-রে” (cosmic ray) বলে, সেগুলো কি ঐ রকম ধারা এ্যাটমের “গুহাভন্ম” থেকে জন্ম নেয় ? একটা ধুলো সত্যি সত্যি লোপাট হ'লে—তার এ্যাটমগুলো নিজেদের শক্তির ভাণ্ডার দশদিকে লুটিয়ে দিলে—তাতে বিশ্বের সব বৈঠকেই টনক নড়বে নিশ্চয়ই । এ বিশ্ব-কনসার্টে সুরবাঁধা একটা যন্ত্রের সঙ্গীতী তারটি কেটে গেল যে । তবে প্রত্যেক রকমের গুহাই নিজেকে আপন এলাকাটিতে শক্ত ক'রে আটকে রাখে । যত না ভেতরের গুহা—যেমন ঐ এ্যাটমের—তত দেখি, সে যেন নিজেকে একটা বজ্রের দেউল দিয়ে ঘিরে রেখেছে । তাকে ভাঙ্গা বড় সাধারণ কর্ম নয় । কিন্তু রেডিও-এ্যাকটিভিটিতে (radio-activity) অথবা অন্য কোনো কোনো কৃত্রিম বা স্বাভাবিক অবস্থায়-ব্যবস্থায় সে বজ্র আঁটুনিও টুটে যায় দেখি । একেবারে খাঁটি বজ্রস্বরের “দেউল” হ'লে কিছুতেই ভাঙ্গতো না । গুহা হ'ত অজর-অমর । প্রকৃতির কারখানায় তেমন কোনও “খাতু” পয়দা হ'য়েছে কি ? হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না । তবে, আসল না হ'লেও নকল বজ্র, বজ্রের অনুকল্প আছে কিন্তু কিছু ।

যাই হোক, বিজ্ঞানের বর্তিকা হাতে ক'রে পাষাণী-গুহার ভেতরেও খানিকদূর ঢুকে পড়েছি দেখছি । সেখানেও মহলের পর মহল

পার হ'তে হয় ; ব্যূহের পর ব্যূহ ভেদ করতে হয় দেখছি। একেবারে কেন্দ্রটিতে,—মর্মপূরীতে, মণিকোঠায়—যে শুয়ে আছে, সে এখনও সাড়া দেয়নি। বিজ্ঞানের ঐ সব জবর “এ্যাটমিক বোম্বার্ডমেন্টেও” (atomic bombardment) দিব্য শাস্ত হ'য়েই যেন ঘুমোচ্ছে সে! সে “পুরুষ”, সে “আত্মা”—আমার এই অপরূপ আপন আজব গুহাটিতেও যার পাত্তা শনৈঃ শনৈঃ লাগাতে হয়। সেই একজন! সব কিছুই শুদ্ধান্তঃপুরচারী। বাকি সবাইকার বাইরে আনাগোনা। সব কিছু গুহাই তার গুহা। ওভারসিয়ার সে-ই, মিস্ত্রীও সে-ই। আবার ছুদিনের “ভাড়াটে” ব্যাপারী, কারবারীও সে। তাকে আরও তলিয়ে গিয়ে চিনতে হবে।

চিনতে যাবে? নানান ভোলের গুহা দেখতে দেখতেই চল না কেন! এই সব নানান ভোলের গুহা দেখতে দেখতে এমন গুহা হয়ত মিলে যাবে, যাতে পেয়ে বসবে—সব গুহার অন্তরতম ঠাই, ঢুকে পড়ার আসল সত্য “সন্ধিটি”। সন্ধিটি পাওয়া চাই, আর খোঁড়বার একটা হেতের-টেতের যোগাড় করাও চাই। চির-প্রস্তুত মনবিজলীর টর্চও চাই। এমন এক গুহা আছে কি কোথাও, যেটায় ঢোকান যত্ন ক'রে গেলে, তাতে ক'রে সব গুহাভেদের সন্ধিও মেলে, ফন্দিও মেলে? একভাবে দেখতে গেলে বিজ্ঞানও দেখি চাবি, বাতি, হেতের নিয়ে সকল গুহা বোরিং করতে লেগে গেছে। বোরিং হচ্ছেও বেশ। ইলেকট্রন কোয়ান্টা (Electron quanta) এসবের দেওয়ালেও মাথা ঠুকে ফিরতে ঠিক হচ্ছে না দেখছি—ওয়েভ-প্যাকেট (wave-packet) নতুন ওয়েভ মেকানিক্স (wave-mechanics) আরও ভেতরে হয়তো বা নিয়ে যাচ্ছে। “ব্রুট ফ্যাক্টস্”—(brute facts) থাকার তথ্যগুলোও—কতক কতক বাগ মেনে আসছে যেন। কিন্তু সেই একেবারে “অন্তরতম”

সামগ্রীটি কই, কোথা? উপনিষৎ যাকে বলেন—রসতম, মধুমত্তম ইত্যাদি? সেই রসের রস, মধুর মধু, প্রাণের প্রাণ, জ্যোতির জ্যোতি, ছন্দের ছন্দ, কই সে, কোথা? বিজ্ঞানের বোরিং চলতে থাকুক। কিন্তু সেই একটা গুহার সে খোঁজ নিতে ভুলে গেছে বুঝি, যেখানটায় আর আর সব গুহার গোলক-ধাঁধার ভেতর-বাইরের গোপন নক্সাটা মেলে, আগম-নিগমের ঠিক ঠিক অঙ্কি-সঙ্কি হৃদিশিটি মেলে!

সাপ গর্তে মুখ ঢুকিয়ে ল্যাজ ঝুলিয়ে দিয়ে রয়েছে। ল্যাজ ধরে টানাটানি ক'রে সাপটাকে গর্ত থেকে বের করা যাবে না। বিশ্ব-মঙ্গলের প্রিয়া-অভিসারের সেই “মাহ-ভাদর” ঝ'ড়ো রাতের কথা মনে প'ড়ে তো? ল্যাজ ধরে ভেতরে ঢুকে যাকে সে পেল, সে তার চিন্তা, কিন্তু চিন্তামণি নয় যে! মণি থাকে সাপের মাথায়। চিন্তা কিন্তু দিলে মণির খোঁজ। “চিন্তামণির্জয়তু”—প্রিয়ার আমার জয় হোক! মাথাটা কোঁশলে চেপে ধরতে না পারলে চিন্তামণি মিলবে না। বিজ্ঞান সব কিছুর পুচ্ছ ধ'রে এগিয়ে যাচ্ছে, ভেতরেও ঢুকছে। যত গুহার ভেতরে ঢুকছে, ততই বেশি বেশি পাচ্ছে, একভাবে না একভাবে, জ্যোতি, রস, ছন্দের সন্ধান। কিন্তু হাতে মিলছে তার—চিন্তার পর চিন্তা, কন্সপ্টের পর কন্সপ্ট—অবিশ্রান্ত সমস্তা আর সমাধানের লুকোচুরির অফুরন্ত চলচ্চিত্র তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে! যাতে করে সকল গ্রন্থি ভেদ হয়ে যাবে, সকল সংশয় ছিন্ন হবে, তেমন চিন্তামণির নাগাল মিলবে কবে? বিশ্বমঙ্গলকে এ “উলটো” দেখার চোখটি ঘুচিয়ে তবে চিন্তামণি চেনবার সোজা চোখটি ফোটাতে হয়েছিল। অর্থাৎ উলটে শুরু ক'রতে হয়েছিল। বিজ্ঞানকেও তাই করতে হবে, না? “উলট্ যাও”—ব্রহ্মচারিজী যেমন বলতেন।

বিজ্ঞান তীক্ষ্ণধার হেতের নিয়ে গুহার ভেতরে বোরিং করে যাচ্ছে।

কিন্তু সে ভেতরে যাচ্ছে যে-চোখটি নিয়ে, সে হচ্ছে এই কারবারী চোখ না হ'লেও—এই চোখেরই “সুন্দরদেহ”। কারবারী চোখ হচ্ছে বাদসাদ দিয়ে নিজের গরজ, নিজের দরকার, আর ফরমাস মাকিক দেখার চোখ। রঙ্গিন ঠুলি পরা “বাঁকা চোখ”। তার বক্র দর্পণে, নানা সংস্কার-রঞ্জিত দর্পণে কোন ছবিই যথার্থ হয়ে উঠবে না। রাস্তা চোখ আবার বাঁকা চোখ! খাঁটি তথ্য আর পুরা তত্ত্ব তাতে পৌঁছায় না। ক্রতু বা যজ্ঞের জন্তে সৃষ্টি, সবকিছু কারবার—বেদ বলেন, যজ্ঞ মানে—“বলি” দিতে হবে কিছু। অনেক কিছু ত্যাগ করে একটু আধটু “যজ্ঞশেষ” আহার করতে হবে। “পক্ষপাত-বিনিমুক্ত” হ'লে, “অক্রতু” হ'লে, “অবক্রচেতা” হ'লে এ কর্মটি আদৌ চলে না। এ কথা আগেও বলেছি। দেখার চোখটি আবার “রাস্তা” চোখ, শাদা চোখ নয়। কত না রাগ-দ্বেষের সংস্কার তাকে রাস্তিয়ে রেখেছে। তার “ধাতুপ্রসাদ” হওয়াটি চাই—নইলে “ভূতেষু ভূতেষু গৃঢ়ঃ” সেই “গহ্বরেষষ্ঠ” আত্মার “মহিমানং” দেখা হবে না।

কথাটা রকমারি ক'রে বলি। . আমি এই পাথরটিকে দেখি জড়, পাষণ-গুহা। ভেতরে লুকোন শক্তি-টক্কি কিছু থাকতে পারে, কিন্তু এতে প্রাণ নেই, চেতনা নেই, বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। অর্থাৎ এটা আমি যা—তা নয়। আমার ভেতরে যেটি প্রাণন-মনন করছে, প্রকাশ-বিকাশ পাচ্ছে, সবতায় ছন্দোযোজনা করছে, রস সঞ্চার করছে, তাকে “আত্মা” বলবো? আচ্ছা, তা'হলে ঐ পাথরটায় আত্মা নেই। আত্মার পরিচয় রসে, জ্যোতিতে, ছন্দে—বন্ধন স্বীকার ক'রেও তা থেকে মুক্ত হয়ে ফুটে ওঠার স্বাভাবিক আকুতি ও আবেগেতে। প্রতি পা ফেলার চলার পথটি পছন্দ ক'রে বেছে নেওয়ার। এ পরিচয় পাথরটায় পাইনে, কেন পাইনে? পাবার গরজ নেই, দরকার নেই ব'লেই পাইনে। তার সম্বন্ধে যে-ভাবটি,

‘মেজাজটি’, এটিটিউড্ (attitude) আমার এই চলতি জীবন-
 কারবারে বহাল হ’য়ে গেছে, সে মেজাজ হচ্ছে তাকে বলি দিয়ে
 যতটা পারি “আপরোচ” ভোগে লাগানোর মেজাজ। এটা হচ্ছে
 ক্রতুর মেজাজ। কেন এমন হল তার নিদেন দিচ্ছে কে? তবে,
 এ রকম মেজাজের ভাবভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে যে কত যুগের কত
 জন্মের জড়োকরা নিদেনগুলো রয়েছে, তা যেন কতক আঁচ করতে
 পারি। সেই সব “অদেখা” হেতুগুলোর নাম দাও ‘অদৃষ্ট’। তা’হলে,
 পাথরটা পাথর আমার কাছে, কেননা, তার সম্বন্ধে আমার অদৃষ্ট,
 আর আমার সম্বন্ধে তার অদৃষ্ট, তাকে ঐ, তাই বানিয়েছে। নইলে
 যে কাজে লাগাতে চাই তাকে, সে তাতে লাগে না যে! এই
 রেশিও (ratio) বা পারস্পরিক সম্বন্ধটি বদলাও, সেও দেখবে
 বদলাবে। যাদের অদৃষ্ট ওটার সম্বন্ধে অগুরুপ তারা ওকে ঠিক
 পাথর ক’রে দেখে না। কেউ কেউ চিন্ময়, রসময়, ছন্দোময় সত্তাতেই
 ওকে দেখে। কারুর চোখে সবতাতে “ক্ষুরে কৃষ্ণ”। গুহা হবে
 কেন—রাসকুঞ্জ। অদৃষ্টকে বলতে পার—অব্যক্তের স্তর—রেল্‌ম্
 অব্ পোটেন্শিয়ালস্ (realm of potentials)। আমার এই
 গুহার মুখটা ব্যক্ত। সেখানে বাতি জ্বলছে। নানান রঙ্গে, নানান
 কায়দায় জ্বলছে। সার্চ লাইটের মত ঘুরছে ফিরছে। জ্বলছে
 নিভছে আবার জ্বলছে। গুহার ভেতরটায় তার প্রায়টাই অব্যক্ত—
 রয়েছে তার ব্যাটারি, সুইচবোর্ড আর ওয়ার-কনেক্‌শনস্
 (battery, switchboard, wire-connections)। গুহার
 এই সদরে-অন্দরে, ব্যক্তে-অব্যক্তে, দৃষ্টে-অদৃষ্টে একটা সল্লা-সন্ধিতে
 আমার কারবারটা চলছে। সে সল্লা-সন্ধির চলতি সর্বমত ঐ পাথরটা
 পাথরই থাকবে। অর্থাৎ, সাপ থাকবে তার লেজটি বের ক’রে,
 মুখটা গর্তে ঢুকিয়ে। পাথরে শিলাবুদ্ধি ছেড়ে তাকে প্রাণবন্ত ক’রে

দেখতে গেলে ওর সম্বন্ধে আমার কারবারের সৰ্ত্তগুলো বদলাতে হবে। আমি যদি হই ‘ক’ আর সে যদি হয় ‘খ’, তার সম্বন্ধে আমার গুহার কারবারী বন্দোবস্ত যদি হয় ‘গ’, আমার সম্বন্ধে তার যদি ওটা হয় ‘ঘ’, তবে ‘গ’ ‘ঘ’ অনুপাতটা তেমন না বদলালে ‘ক খ’ অনুপাতটাও তেমন বদলাবে না। কথাটা ভাবভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি উলটে যাওয়ার সম্বন্ধে।

বিজ্ঞান দৃষ্টির প্রসার (dimensions, ডাইমেনশন্স) বাড়িয়ে চলেছে ক্রমাগত। কিন্তু চলতি কারবারী অনুপাতটা প্রায় ঠিক রেখেই চলেছে। তার মানে, সে পাথরটাকে পাথর ঠিক করেই, তাতে বোরিং ক’রে যাচ্ছে। বোরিং করার আগে পাথরকে সে মেরেই নেয়; জ্যান্ত, বাড়ন্ত, ফুটন্ত জিনিস দিয়ে ঠিক পেটেণ্ট করা কলকজা তৈরী হয় না যে! যে ধাতুতে কল বানাচ্ছি, সে ধাতু যদি আপন মরজিতে, আপন তালে খেয়ালে বাড়ে কমে, এখার ওখার স’রে ন’ড়ে যায়, তবে তা দিয়ে ঠিক ঠিক কল তৈরী হয় কি করে? প্রাণীর দেহটা ত’ ঠিক কল নয়, খানিকটে কলের মতো। পাথর হয়েছে একটা বা অনেকগুলো “মেশিন।” প্রাণ-চেতনার খোঁজ নেওয়া দূরে থাকুক, প্রাণ-চেতনা ওতে নাই ধরে নিয়েছি, যত কিছু তার যন্ত্র-তন্ত্র-রহস্য-ভেদ, মন্ত্র-চেতন্যটি না হ’তে হ’তেই! পাথর আর তার দানাগুলোকে শুধু তাদের বিশ্বাসটি ছ’কে নিয়ে সংজ্ঞা লক্ষণ সবই মেকানিক্সের হুকুম মার্কিন্ ক’রে নিয়ে, তবে বিজ্ঞান যত কিছু সমীক্ষা, পরীক্ষা, অসীক্ষার কর্মে নামে। অসীক্ষার আসল বস্তু হচ্ছে গণিত। “বলি” ছাড়া গণিতের গতি নেই, বলি—এবষ্ট্রাকশন্, এলিমিনেশন্, লিমিটেশন্ (abstraction, elimination, limitation)। পুরা গোটা যে জিনিস—লিভিং হোল্ কনক্রিট— (living whole concrete) তাতে গণিতের গতি নেই।

পার্টিকেল, মলিকিউল, অ্যাটম, ইলেকট্রন, প্রোটন (particle, molecule, atom, electron, proton)—সবই গণিতে মাপ্যবী বিশ্বকর্মার হাতে “গড়া পেটা” হয়ে তবে বিজ্ঞানের কারবারে চল হবে। বিজ্ঞানের এই “ক্রতু দৃষ্টি” এমন সর্বনেশে যে, স্পষ্টত প্রাণের মনের দেশে এসেও সে ঐ মেশিনকেই দেখবে। জগন্নাথ দেখতে এসেও পুঁইমাচা! প্রাণের অঙ্গ, অন্তঃকরণের অঙ্গগুলোকেও পিওর মেশিন করে না দেখা অবধি যেন তার স্বস্তি নেই! অবশ্য, এ রকম করে গোণা-গাঁথা ধরাবাঁধা যে হিসাব, তার খুব সুরাহা হয়। হচ্ছেও কিছু কিছু। কিন্তু আসলে তথ্য এবং তত্ত্ব দুই-ই মরে কাঠ হ’য়ে মেশিন থেকে ফরমুলার লেবেল এঁটে বেরিয়ে আসছে! ভরসার কথা, বিজ্ঞান নিজেই ভেতরে ঢুকে ব্যাপারখানা কতক কতক আঁচ করতে পারছে বোধ হচ্ছে। বিশেষ করে অ্যাটমের ভেতরে ঢোকান পর থেকে। গতি আর স্থিতি দুই-ই নিশ্চিত, ব্যবস্থিত হলে খাঁটি মেশিন হল। কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখছি—এ ছয়ের একটাকে চেপে ধরলে আর একটা হাত পিছলে যাচ্ছে।

ঠিক কেন্দ্রে যেটি আছে—সেই প্রাণের প্রাণ, জ্যোতির জ্যোতি রসের রস, ছন্দের ছন্দ—গোড়া থেকে তার দিকে পেছন করে—‘পরাজুখ’ হয়ে—বোরিং করে যাচ্ছে বলে ঠিক লক্ষ্যভেদও হ’চ্ছে না, কেন্দ্রে সিধে গতিও হচ্ছে না। উলটে পেছন হেঁটে চলতে গিয়ে ঝাজু, অবক্র, অক্রতু, বস্তুটি মেলেনি। অথচ, তার “গা ঘেঁসে” সুড়ঙ্গ কেটে যাচ্ছে—সুড়ঙ্গ কেন্দ্রের জ্যোতিরসের অগ্নীবোমের যেটন উৎস, তার চারধারে আপনাকে ক্রমাগত পেঁচিয়ে যাচ্ছে। পতঙ্গ যেমনধারা ফানুস ঢাকা আলোর চারধারে বাঁ বাঁ করে ঘোরে! মাঝে কোন আজব ফটিকের দেউল; তাতে ঠেকে হীরের ধারও ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। আরও আলো, আরও সান্ধা আলো,

আরও রস, আরও ছন্দ, আরও উদার সমৃদ্ধ ছন্দ—কিন্তু যেখানে তার কাঠী, তার গতি, তার পরায়ণ, তার পান্ডা লাগছে না ; তাকে উল্টে সোজা হতে হবে—গুহার বাইর মুখ থেকেই। শ্রোডিঞ্জার, ত্রুগলি, বড়্, জরুডান, ডাইরাক, হাইজেনবার্গ, আইনস্টাইন—এঁরা কি উলটোবার ফিকির কেউ বাতলাচ্ছেন ? ভরসা হয়, হয়ও না। না, ব্রহ্মচারি মহারাজের মতো উত্তরাখণ্ডে এসে আত্ম-প্রকাশজীর কাছে উলটোবার মূল পাঁচটা সাধতে হবে ? আগে আত্মবিকাশ আর আত্মপ্রকাশের বৈঠকটি কোন সন্ধিতে মেলা চাই ? সেই “আত্মানং বিদ্বি ?” “নো দাইসেল্ফ” (Know thyself) ? সেইখান থেকে শুরু না হওয়া পর্যন্ত সব কিছুর প্রতি উলটে পেছন হেঁটে চলা ছাড়া উপায় নেই। আপনার সাক্ষাৎ অনুভবে যদি বুঝি প্রাণ এই, জ্যোতি এই, রস এই, ছন্দ এই, তবে না ধরতে পারবো ওতে তাতে রইল কি না রইল। আগে আপনাতে ওসব চেনা, তারপর না সবতাতে সেই চেনাকে আরও ফুটিয়ে ফুটিয়ে চেনা ও সেই আনন্দকে আরও তারিয়ে তারিয়ে আনন্দন ! খাঁটি চাকভাঙ্গা মধু খেলাম না এ জন্মে, বুঝবো কেমন ক’রে যে ওতে এত সাক্ষা সরেস মধু !

তাই ব’লে বিজ্ঞানের এই রকম ধারা উলটোমুখে বোরিং করা কি বন্ধ ক’রে দিতে হবে ? তা নয় ! ঐ রকম বোরিং-এর ফলে গুহার নানান ভোলের ভেতর তার আসল প্যাটার্নটি ধরার সুরাহা হ’য়েছে বলে মনে হয়। পাঁচটা জিনিস স্পষ্ট হ’য়ে উঠছে। প্রথম, এই পাথরটা ঐ ধুলো-বালিটাও একটা ছদ্ম গুহা। বাইরে ওকে যা দেখছি, ভেতরে ও তা নয়, আসলে ও তা নয়। বাইরে নিরেট, আড়ষ্ট ছোট, ভেতরে ঢালাও ফাঁকা, মহা ছুঁটাছুঁটি ব্যস্ততা, আসরের প্রচুর বিশালতা। দ্বিতীয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর সঙ্গে ওর

সত্তাশক্তি, হৃন্দের সম্পর্ক। অসঙ্গ উদাসীন হয়ে একলা প'ড়ে নেই কেউ। একটা অসীম সত্তাশক্তি আর হৃন্দের মহাসাগরে ও হচ্ছে একটা আবর্ত। বিরাট বিচিত্র—বুনন-সম্বন্ধ-জালের একটা গ্রন্থি। তৃতীয়, ওর গুহাটি মহলের পর মহল এইভাবে সাজানো। যত ভেতরমহলে ঢোকা যায়, ততই তার সত্তাশক্তিকে বেশি ঘনীভূতভাবে দেখি। আকারে আয়তনে ছোট হচ্ছে, কিন্তু বল তার বাড়ছে, গতিও তার বাড়ছে। তার ব্যুহটাও নিজেকে খুব শক্ত ক'রে ধরে রাখছে। এ্যাটমের অন্তঃপুরে জীব-কোষের, বিশেষ করে, একটা জীবন্ত বীজের অভ্যন্তরে, সত্তার শক্তি-হৃন্দের প্যাটার্ন এবং ল'-এর (pattern and law) এক অদ্ভুত ঘনীভাব দেখছি। চতুর্থ, জড়ই হোক আর প্রাণই হোক, প্রত্যেক গুহার ঐ ভেতরকার ঘনীভাব কেন্দ্রটি, নিউক্লিয়াস (neucleus) হচ্ছে শুধু একটা ভাণ্ডার নয়, সেটা হচ্ছে একটা উৎস—ফোয়ারা! রেডিওঅ্যাকটিভ জিনিসগুলোতে, প্রাণীর বীজে এই ফোয়ারাটাকে বিশেষ ক'রে ফুটে উঠতে দেখি বটে, কিন্তু সব কেন্দ্রই এক একটা ফোয়ারার প্যাটার্নে তৈরি। ফুটে চারধারে ছড়িয়ে পড়া, এর প্রতীক যদি বলি পদ্ম, তবে গুহা মাত্রেরই নাম পদ্মগুহা। চলতি ব্যবহারে সেটা শুধু সদগুহা বেশগুহা। বিজ্ঞান প্রথমেই তাকে ধরিয়ে দেয় ছদ্মগুহারূপে। শেষকালে, ছদ্মগুহা হ'তে চলে পদ্মগুহা। পঞ্চম—ফোয়ারা কিসের? জড়ীয়, মেটিরিয়াল ব'লে যে সত্তাশক্তি, হৃন্দ আমাদের ব্যবহারে কাটছে, সেগুলো ঐ অন্তরতম ফোয়ারার কাছাকাছি যেতে যেতে ভোল ফিরিয়ে নতুন হ'য়ে যাচ্ছে যেন। বাইরের স্তরে ওদের যা রূপ, ভেতরে গিয়ে সে রূপ তাদের ধোপে ঢিকছে না। এমন কি, হৃন্দ বা ল'গুলোও ভেতরে নতুন মূর্তি ধরছে। অন্তর্লোকটা যেন আর কি ধাতু দিয়ে তৈরি; তার অবস্থিতি, পরিস্থিতি, তার আইন-কানুন যেন স্বতন্ত্র,

অন্য জগতের। ধাতুটা কোন এক রকম তৈজসধাতু মনে হচ্ছে। কিন্তু তার গোত্র জানা নেই। যাতে ক'রে সব জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, আবার যাতে সব মিলিয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি বলি রস, তা হ'লেও তৈজস ধাতু রসও বটে, ছন্দও বটে। সব কিছুর সুর, মাত্রা, তাল তা থেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের কাঠামোটা, মেকানিজম্ (mechanism) আঁকড়ে রইব, এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি ব'লে, ছোটো আসল বস্তু কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। মেকানিজমের জাল যত না ঠাশবুনন করছি, ততই তার ভেতর দিয়ে গ'লে বেরিয়ে যাচ্ছে—তাকে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে—জ্যোতির, রসের, ছন্দের যেটা সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপ, আর যেটা তাদের পূর্ণ, সর্বাঙ্গীন সম্বন্ধ-সমৃদ্ধ রূপ। যন্ত্র আর যন্ত্রানুপাতী গণিতও একটা চক্রদর্পণ। তাতে তত্ত্বের সবটা আসবে না। তত্ত্বের ঠিক রূপটাও আসবে না। তবে, হ্যাঁ, গণিতের ফলক টর্পেডোর মত প্রায় বজ্রমুখ। ওতে প্রায় সব গুঁহাই ভেদ হ'য়ে যাচ্ছে। এই জগৎ, গুঁহার গঠনতত্ত্বটি বিজ্ঞানের রীতিতে বোঝার সুবিধে হচ্ছে। এ ছাড়া দলে ভিড়ে চলতে গেলে “এন্ট্রপি” (entropy) বলে একটা জিনিসের পাল্লায় প'ড়তে হয়। তাতে ক'রে সবই যেন ক্রমে গুলিয়ে “গোলমালে” হবার দিকে চলেছে। ‘রাইনিং ডাউন অফ্ দি ইউনিভার্স’ (Running down of the universe)। সে যাই হোক, ছোটো—গুঁহা আর গুঁট। এন্ট্রপির কথা না ভেবে গুঁহার প্যাটার্ন না হয় কতক বুঝলাম, কিন্তু গুঁহাতে গুঁট যে সামগ্রীটি তাকে? গুঁট তত্ত্ব?

এ সবার মূলে হচ্ছে একটা গুঁহা, তার নাম দিই আত্মগুঁহা। সদ্ম, ছদ্ম, পদ্ম, আত্মগুঁহা; এ আত্মগুঁহা পঞ্চকোষ, শরীরত্রয়, দেহ-প্রাণ-মন, চিন্ত-বুদ্ধি-অহঙ্কার—এই রকম সব ধাতু দিয়ে তৈরি বলে শুনি। স্তরের পর স্তর, দেউলের পর দেউল, মহলের পর মহল,

এখানেও। কিন্তু এ প্যাটার্নে তিনটে বিশেষত্ব একটুখানি খোঁজ-
 খেয়ালেই দেখতে পাই। প্রথম, তেজ, রস, ছন্দকে এখানে সাক্ষাৎ
 অনুভূতিরূপেই পাই। বুঝি জ্যোতি বা আলোটা মূলে এই; রসটা
 স্বরূপে এই; ছন্দটা প্রতিষ্ঠায় এই। দ্বিতীয়, আর সব তাতে
 ফোয়ারাগুলোকে ফুটে দেখি বেশি বেশি বাইরের “তাগিদে” যেন।
 রেডিয়াম জাতীয় জিনিসগুলো কতক ভেতরের তাগিদের আঁচ
 দিলেও, এখানে আমাতে ভেতরের তাগিদেই, আপন গরজে, আপন
 লীলায়, স্ফূর্তিটি হ’তে চাচ্ছে দেখি। স্বতঃস্ফূর্তিটি হবার যোগ্যতা
 আর সম্ভাবনাটি এখানে সুস্পষ্ট। ছন্দ, খাত বা “ল” (Law)
 এখানে খাঁটি লীলারূপে ফুটে উঠতে চায়। তৃতীয়—বাইরের বিচিত্র
 বিপুলতায় বা কিছু সত্তাশক্তি, ছন্দ নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছে, তা-
 দিগকে সবই দেখতে হয়, ভাবতে হয়, সাজাতে-গোছাতে হয় এই
 এক স্থির কেন্দ্রের আভিমুখ্যে—সব কিছু ফ্রেম অব রেফারেন্সের
 (frame of reference) অরিজিন (origin) বা আরম্ভক ও
 নিয়ামক বিন্দুটি হ’ল এখানে। এ কেন্দ্রটি স্থির তো সব কিছুর
 প্রতিষ্ঠা; এটি ন’ড়ে গেল তো সব কিছুই তাল পাকিয়ে গেল।
 অসীম সত্তা, শক্তি, খাত—অথবা বল, অনন্ত জ্যোতি, রস, ছন্দ—এই
 আমাতে একটা নিরতিশয় ঘনমূর্তি এবং সকল ছন্দের প্রতিষ্ঠার
 “পিভট” (pivot) রূপটি ধারণ করেছে। সেটা হচ্ছে—“আমি”,
 আত্মা। আবার, নানান ধাতুর নানান ধাঁজের অপরূপ এক গুহাও
 বানিয়েছে তার চারধারে। সদ্দ, ছদ্দগুহা আর পদ্দগুহা—তাতে
 সে আপনি গুঁঢ় হয়েছে। ব্যক্ত, অব্যক্ত, ক্ষয়, অক্ষয় হয়েছে।
 ব্যাপারী, কারবারী হ’য়েছে। তার গুহা কেঁদে বসা মানেই হচ্ছে
 আপনাকে আপনার কাছ থেকে যতটা পারে আড়াল করা; নিজের
 কাছে নিজে উর্গে যাওয়া; আত্মাকে যতটা পারে অনাস্র করে

দেখা। আপনার সঙ্গে আপনার সঙ্গে আপনাতে আপনতে লীলা হয় ; কিন্তু কারবার হ'তে গেলে “পর” কেউ চাই। আমার মতো নয়, এমন কেউ চাই। ভগবানে ভক্তে লীলা, যে অপ্রাকৃত, যে ‘পর’, তার সঙ্গে ? তাতে নয়। আমার সঙ্গে একান্ত আমার যে, তারই লীলা। তদীয়া রতি মদীয়া রতি। অপ্রাকৃত চিন্ময়, ভাবময় লোকে এ লীলার ললিত বিদগ্ধ যুগল। বাই হোক, পর খাড়া করতে গিয়ে আত্মার ভেতরে-বাইরে অনেক কিছুই আমার মতো আর রইল না। বাহ্য হ'লো, অচিৎ হ'লো, জড় হ'লো, পাথর হ'লো। তাতে জ্যোতি নিভে গেল, রস শুকিয়ে গেল, ছন্দ আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। নিজের অন্তরটা, দেহটা, জগৎটা অনান্য, পর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। তাকে উলটিয়ে পেছন ফিরিয়ে দিলাম।

আমার এই কারবারী বিশ্বটা হচ্ছে, ‘উলটা উৎপত্তি’। এ উলটোকে উলটে সোজা করে নিতে হ'বে, আগে যেমন শুনেছি ব্রহ্মচারিজীর মুখে। তখন—আত্মা থেকে শুরু করলে—দেখব গুহাগুলো আর ঠিক গুহা নেই। সবাই হয়েছে এক একটা জ্যোতির, রসের, সুরের ফোয়ারা। বিকাশের উন্মেষের মণি-পদ্ম। ফুটে যাচ্ছে, ফোটার অবধি নেই, শেষ নেই ! অগুপ্তি পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে ফুটে যাচ্ছে। সহস্রার পদ্ম।

বিজ্ঞানের পথে উলটো উলটোই থেকে যাচ্ছে। তবে সব কিছুকে এমন এক ঠাঁই সে এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, যাতে তার উলটোরূপের ওপর হচ্ছে এক উজ্জল হ'তে উজ্জলতর আলোকসাম্পত ! তাতে ক'রে উলটো যদি নিজেকে উলটো বলেও ধ'রে ফেলে তো কাজ প্রায় হাঁসিল হ'য়ে গেল। বিজ্ঞানের জগতটাকে আগে কেউ কেউ মায়াপুরী বলতেন। এখন কেউ কেউ মানসী-সৃষ্টি বলছেন। তা হ'লে মনের কোথাও লুকিয়ে র'য়েছে কি, এটাকে স্বরূপে স্বচ্ছন্দে

কুটিয়ে তোলার যে বীজমন্ত্র, সেইটে? বেদ এই বিশ্বকে ‘বন’ বলছেন, আর জিজ্ঞেস ক’রছেন—কি কুহক-কাঠে তৈরী এই আজব বন? বিজ্ঞান বনমুখো চলেছে সেই কুহক কাঠের সন্ধানে। তাকে কি এবার বনমুখো হ’তে হবে? উলটে সোজা হ’তে হ’বে?

শুধু বনমুখো হ’লেই হ’বে? মন-সরষেও যে ভূতে পাওয়া। আমি তো বনমুখো হ’ব, কিন্তু মন হ’বে কোন্ মুখো? তার আনন্দ কিসে, ব্যাসঙ্গই বা কিসে? টেকি শুনেছি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বিজ্ঞান “চিন্তামনির নাচ-ছুয়ারে” গিয়েও যদি টেকিটি তার ছাড়তে না পারে তো, সেখানেও সেই টেকির কচকচি ছাড়া আর কিছু বাজে না। একরাশ থিওরি কন্ভেনশনে আর ইকোয়েশনে (theory, convention and equation)! ফিজিকাল কেমিস্ট্রির মতো ফিজিকাল সাইকোলজি-টাইকোলজি জন্মাবে। কিছু কিছু জন্মিয়েছেও। বনমানুষের হাড় ছুঁইয়ে সব কিছু মরা-যন্ত্রের কাঠামো এবস্ট্রাক্শন (abstraction) বানাতে গেলে, প্রাণ, মন, চিত্ত আমি—কেউই আসলে তাদের গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে না সাধ ক’রে মরা কাঠ হ’তে। তাদের এক একটা নকল “কুশপুত্তলিকা” পাঠিয়ে দেবে—যন্ত্রে আর ফরমুলায় খাপ খাবার জন্তে। খাপ না খায় স্বচ্ছন্দে সেটা পুড়িয়ে ফেল, আর একটা অগ্নি ভোলের সন্ধান মিলবে তখন। অথচ, যন্ত্র চাইও। বনমুখো হ’তে গেলেও। তবে শুধু যন্ত্র বা মরা কাঠামো মাত্র নয়। যন্ত্র হবে স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতীরসের বা সত্তাশক্তির যে সদা সজাগ উৎসটি তারই লীলা-ছন্দের একটা মরমী মাত্রা-সংগ্রহ, একটা সজীব স্রলিপি।

বনমুখো দৃষ্টিটাকে বনমুখো ক’রে গুহাটার খোঁজ পাই, সেটা ঐরকম স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতী-রস-ছন্দের একটা ফোয়ারা। কিন্তু

নানান গণ্ডী স্বীকার করে নিজেকে যেন আটকে চেপে এতটুকু করে রেখেছে। দেহগুহা, গেহগুহা, দলগুহা, জাতগুহা এই সব তার গণ্ডী, তার বাঁধন, তার কারবারী যন্ত্র। এ সবে র ভেতর দিয়েও সে বাঁধন ঠেলে মুক্তি চাচ্ছে, তার আপন বিকাশ ও আপন স্ফূর্তি, আপন রসাস্বাদটি অক্লপণ, অকুণ্ঠিত করতে যাচ্ছে। তার বিকাশ কার্পণ্য তার প্রকাশ-কুণ্ঠা সে ক্রমাগত অতিক্রম করে যেতে চায়। দেহ-গেহের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়ে, সমাজ, জাতি, দেশাত্মা, বিশ্বনর, সর্বপ্রাণী, সর্বভূত, শুদ্ধ বুদ্ধ হতে চায়, পূর্ণ চরিতার্থ হতে চায়। 'বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি', এই রকম ধাপে সে মুক্ত হ'তে চায়; এটা কেবল শ্রেয়ের পথ নয়, যথার্থ প্রেমের পথও বটে। এ পথের সীমা কোথা? তপোবনের সাধু-সন্তরা এই একমাত্র চলার পথে পথচলার কোনও নতুন অন্ধি-সন্ধি দেন নাকি? যাতে ক'রে এই অফুরন্ত স্পাইরেলটাকে সরল সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত ক'রে নিলে নেওয়া যায়?

শান্তিবচনম্

শ্রমিতি যদপি ভূতং জীবতন্তশ্চ শান্তিঃ
 শ্রমিতি ন চ কদা যদ্ ধূলিবৎ তন্ত শান্তিঃ ।
 উপরি বিচরতোহধঃ পাতিতশ্চ শান্তি-
 শ্চিরকৃচি লসতো বা জীৰ্য্যতো বাস্ত শান্তিঃ ॥
 প্রবলপৃথুগতো বা দান্তিকে দন্তশান্তিঃ
 স্থলিতমৃদুগতো বা দুৰ্বলে ক্লৈব্যাশান্তিঃ ।
 সুপথকুশলধাম্নে জীবিতশ্রাদ্ধশান্তি-
 স্তদভিলষিতপূৰ্ণৈর্ভ্য চান্ননঃ পূর্ণশান্তিঃ ॥

শান্তিবচন

যেখানে যে প্রাণী লইছে নিঃশ্বাস
 তারে দাও শান্তি, দাও শান্তিময় !
 পড়ে' রয় ধূলিরেণু প্রাণহীন,
 তারে দাও শান্তি, চিরশান্তিময় !
 যেবা উদ্ধৰ্গামী, যেবা পতিত ধূলায়,
 যেবা ছাতিমান, যেবা জীর্ণ বিমলিন,
 সবাকারে দাও শান্তি, দাও শান্তিময় !
 দন্তভরে কাঁপায় মেদিনী—
 বলদৃপ্তে দাও দন্তশান্তি, দাও শান্তিময় !
 পদ্ব কাৰ্পণ্যকুণ্ঠায়
 দুর্বলেরে ক্লৈব্যাগ্নিশান্তি, দাও শান্তিময় !
 উজ্জ্বল যে ধাম মহীয়ান
 তারি পাশ্বে জীবনেরে, কুশলাধ্বশান্তি, দাও শান্তিময় !
 আর, সর্বশান্তি-পরিসীমা তোমা ইচ্ছার পূরণে,
 পূর্ণ আত্মনিবেদনে, দাও পূর্ণ শান্তি, চির পূর্ণশান্তিময় !

